ঝাঁপতাল

ঝাঁ প তা ল

লীলা মজুমদার

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

প্রথম সংস্করণ :
৭ই অগ্রহায়ণ,
১৮৮০ শকাব্দ

দু টাকা
পঁচাত্তর ন. প.

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

উৎসর্গ

আমার বন্ধু প্রশান্ত রায়কে
যার চোখ রঙ চেনে

টুলের ওপর চড়ে সেই অল্প আলোতেই অলিমাসিমা বড় আলমারিটার কারিকুরি করা মাথার পেছনে হাতড়াতে লাগলেন। তেল ঘি লেগে-লেগে এমনধারা চেহারা হলে কি হবে, সত্যিকারের মেহগেনি কাঠের আলমারি। নেপুর বাবা জন্মে অবধি কখনো কোনো খেলো জিনিস কেনেন নি।

দিয়েছিলও ভগবান মচ্ছি ভেঙে; বাড়ি-ঘর, পাবনার জমিদারি, জুড়িগাড়ি, বংশ, রূপগুণ, ব্যাঙ্কে টাকা। অঢেল দিয়েছিল। তা সে প্রাণ ভরে ভোগও করে গেছে। মরবার আগে শেষ ইচ্ছে হল একটু গড়গড়াটা টানবে। সে-সময় এখন-যায় তখন-যায় অবস্থা, হাতের কাছে রুপোর গড়গড়া, তাই এনে দেওয়া হল। ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। একতলা থেকে নবাবী আমলের হাতীর দাঁতের গড়গড়া আনতে আনতে প্রাণটা বেরিয়ে গেছিল।

টুলের ওপর থেকে অলিমাসিমা নিচু ঘরটার চারদিক একবার চেয়ে দেখলেন।

এ-রকম টিমটিমে একটা বিজলিবাতি তখন জ্বলত না। ঐ আংটা থেকেই প্রকাণ্ড পেতলের ঝাড়বাতি ঝুলত। আগে গ্যাসে জ্বলত, পরে পালটে কুড়িটা বিজলি আলো বসানো হয়েছিল। এক সুইচে কুড়িটাই জ্বলে উঠত। এইরকম আলো তখন এ-বাড়িতে ঠাঁই পেত না। ভালো করে দেখাই যায় না। ঘরের কোণে কোণে আঁধার জমে থাকে, কুকুরদের খাবার থালাগুলো পায়ে লেগে উল্টে যায়, তখন আবার তোল-রে মোছ-রে।

এই যে বাক্সটা হাতে ঠেকেছে! অলিমাসিমা সাবধানে একটা রঙ-ওঠা মরচে-ধরা হাণ্টলি-পামারের বিস্কুটের টিন নামালেন। এ-রকম

টিন তখন ডজন ডজন আসত। নেপুর বাবা কিন্তু এ বিস্কুট খেতেন না। তাঁর জন্য আসত গ্রেনোব্‌ল্‌ বিস্কুট, প্রত্যেকটা বিস্কুটের চারদিকে ফুলকাটা কাগজের লেস জড়ানো থাকত।

আচমকা দরজা খুলে কেয়া এসে ঘরে ঢুকল।

ওকি মাসি, টং-এ চড়ে ও আবার কি হচ্ছে?

অলিমাসিমা সাবধানে নামতে গিয়ে টিনটা মাটিতে পড়ে খুলে যায়, ভেতরকার বহু যত্ন করে সংগ্রহ করা সামগ্রী ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে। কেয়া হেসে আকুল হয়।

আমি তুলে দিচ্ছি, মাসি, তোমার পায়ে না গুপো বলেছিলে? পাড়া-বেড়ানো ছাড়া অন্য কিছু করতে গেলেই না তোমার হাঁপ ধরে?

কেয়ার কথা শুনলে গা-জ্বালা করে। কিন্তু সত্যিই আজকাল নিচু হতে গেলে হাঁটুর পেছনটা টনটন করে।

মাসি!

কেয়ার হাতে ছাই রঙের পশমের গুলি। অলিমাসিমা সেটি ছিনিয়ে নিয়ে টিনের মধ্যে আবার ভরে ফেলেন, হাতটা একটু কাঁপেত থাকে। আজকাল এও আরেকটা উপসর্গ জুটেছে, হাত কাঁপে, পা কাঁপে।

কেয়া বলে, ও, এইজন্যই বুঝি নেপুদির পশম কম পড়েছিল?

অলিমাসিমার গলা দিয়ে কর্কশ স্বর বেরোয়ঃ সে সাত লাচ্ছি কিনতে দিয়েছিল, তাকে সাতটা গুলি পাকিয়ে গুণে দিয়েছি, জিগেস করে দেখতে পারো।

কেয়া হাসে।

চটো কেন, মাসি? যা কৃপণের জাসু এরা! চল্লিশ বচ্ছর আছ, এক পয়সা মাইনে বাড়ায় না! বেশ করেছ, নিয়েছ।

অলিমাসিমা উঠে দাঁড়ান।

মাইনে আবার কি গা ? আপনার মাসি হই ওর, হলই বা একটু দূর সম্পর্কের, ঘরের লোকের মতো থাকি, রাঁধি-বাড়ি, খাই-দাই, এর মধ্যে আবার মাইনের কথা কোত্থেকে ওঠে শুনি ? মাস-কাবারে বুড়ী মাসিকে দশটা টাকা হাতখরচ দেয়, সেদিকে তোমার অত নজর কেন ?

কেয়াও উঠে দাঁড়ায়, ছোট একটা হাত দিয়ে মুখ ঢেকে হাই তোলে, মাথার ওপর পাতলা হাত-দু'খানি তুলে, নীলাম্বরী-জড়ানো হাল্কা শরীরটাকে টান করে গা মোড়ামুড়ি দেয়। আলগোছে বাঁধা খোঁপা থেকে একটিমাত্র প্রকাণ্ড রুপোর কাঁটা খসে যায়, পিঠময় কালো এলো চুল ছড়িয়ে পড়ে। কাঁটাটা কেয়া তুলে নেয়।

কেয়া বলে, লক্ষ্মী মাসি, রেগো না, জানো, আজ আমার মাইনে বেড়েছে ? তোমায় একটু ভাগ দিতে ইচ্ছে করে।

কেয়া একটা গোটা পাঁচটাকার নোট অলিমাসিমার হাতে গুঁজে দেয়।

টাকা হল গিয়ে লক্ষ্মী, ওর অমর্যাদা করতে হয় না। নোটটা কপালে ঠেকিয়ে অলিমাসিমা আঁচলে বাঁধেন।

গির্জের ঘড়িতে এগারোটা বাজে। কি করে কেয়া এত রাত অবধি ? সেই কোঁকড়াচুল ছেলেটা আবার হয়তো পেঁাছে দিয়ে গেল। কোথায় থাকে এতক্ষণ, ওদের আপিস তো ছুটি হয় সাড়ে পাঁচটায়।

জিজ্ঞেস না করেও পারেন না।

কোথায় ছিলুম না, তাই বল মাসি। আমাদের কেরানীদের ইউনিয়ন হচ্ছে যে, তার মিটিং ছিল। আবার নিজেদের মধ্যেই মহা খেঁচাখেঁচি। তা কমিউনিস্টরা দলে ভারি, তাদের সঙ্গে অন্যরা পারবে কেন ? শেষ পর্যন্ত একটা রফা করতে হল। যাই মাসি, ঘুম পাচ্ছে।

দোতলায় ওঠার সিঁড়ির নিচেটা নক্সা-কাটা কাঠ দিয়ে ঘেরা, সেইখানে ছোট একটি নেওয়ারের খাটে কেয়া ঘুমোয়, দরজাটা আলগা থাকে, ও-মেয়ের প্রাণে ভরডর নেই।

কি আছে আমার, মাসি, যে নিতে আসবে? আমাকে নেবে? আমার স্বামীই নিল না, আবার চোরে নেবে!

অদ্ভুত মেয়ে কেয়া। স্বামীর কথা নিয়ে হেসে বেড়ায়। সে নাকি বিলেতে গিয়ে মেম বিয়ে করে সুখে আছে। কেয়ার মুখে একটা রাগের কথাও শোনা যায় না। হাসে আর বলে—

বুঝলে মাসি, কি লোক! ভুলিয়ে আমার অমন ভালো-ভালো গয়নাগুলো হাতিয়ে, বাপ-মাকে লুকিয়ে বিলেত পালাল। আর সেখানে কিনা বিয়ে-থা করে মহা আনন্দে আছে। রবিবার-রবিবার নাকি লোক খাওয়ায়; মেমকে বাংলা রান্না শিখিয়ে নিয়েছে। ওর জন্য কেন সিঁদুর পরব, বল? তবে একটা ওয়েডিং রিং পাই তো পরে দেখতে পারি!

অলিমাসিমার মনে হয় কেয়ার এখানে পড়ে থাকাটা ভালো দেখায় না। নেপুর বাবা না-হয় মানুষই করেছিলেন, অমন তো কত ছেলে-মেয়েই মানুষ করে দিয়েছিলেন, কই, আর কেউ তো এখানে এসে পড়ে থাকে না।

কি করি, মাসি, স্বামীই ভেগে পড়ল, এখন কি শ্বশুরবাড়িতে থাকাটাই খুব ভালো দেখায়? ওঁরা দিনরাত আমাকেই দোষ দেন। তাছাড়া কি সেকেলে গোঁড়া বাড়ি রে বাবা! ওখানে আমি টিকব কেমন করে? তার ওপর অবস্থাও এখন খারাপ হয়ে গেছে। ও-কথা বোলো না, মাসি।

কেয়া শুতে চলে গেলে পর টিনটাকে আবার আলমারির মাথায় তুলে রাখতে হয়। কিন্তু লম্বা রেশমী মোজাটাকে আর ওখানে রাখা

নয়। কেয়ার মতো অহঙ্কারী মেয়েরা কখনো অবিশ্যি পরের জিনিসে হাত দেয় না, তবু কি দরকার! কোনদিন হয়তো নেপুদের সামনেই কি বলে বসবে।

ভারি দেমাক মেয়ের। থাকে এখানে কিন্তু খায় না, কোত্থেকে খেয়ে আসে ভগবান জানেন। তবে প্রায়ই কিছু কিনে বাড়িতে আনে, অলিমাসিমাকে খাওয়ায়। কম গুমোর নাকি! অথচ এই অলিমাসিমাই একদিন, কিছু মনে না করে, কি ছুটো কথা বলেছিলেন, ভালো করে এখন মনেও পড়ে না কি কথা, আর অমনি মেয়ে এ-বাড়ির খাওয়াই বন্ধ করে দিলে! রাগও করল না, চেঁচামেচি কান্নাকাটি কিছুই নয়। শুধু জল ছাড়া আর এ-বাড়ির কিছু খায় না। কাউকে বলেও না কিছু, নেপু পর্যন্ত এ-বিষয় ঘুণাক্ষরেও জানে না।

বসে থেকে-থেকে পায়ে খিল ধরে যায়। অলিমাসিমা উঠে গিয়ে মস্ত মস্ত দরজাগুলোর লোহার হুড়কো পরীক্ষা করেন। বাইরে থেকে কুকুরগুলোকে ঘরে তুলে, নেপু কখন দোতলায় নিয়ে গেছে। আর কোনো কাজ নেই। অলিমাসিমা ছোট দরজাটাও বন্ধ করে দেন।

তবু শুধু বারোটা বাজে। একটা দেড়টার আগে চোখে ঘুম আসবে না, ভোর সাড়ে পাঁচটায় ঘুম ছুটে যাবে। এ নিয়মের আর অন্যথা হয় না। জেগে শুয়ে থাকা বড় কষ্ট।

নিচু হয়ে বড় তক্তাপোশ ছুটোর তলা দেখতে হয়। বলা যায় না, কে কখন ঘরে সেঁদিয়ে যদি লুকিয়ে বসে থাকে। নিচু হলেই কোমরে খিচ ধরে, কষ্ট করে সোজা হতে হয়। আগে এরকম হত না।

তক্তাপোশগুলি নেপুর ঠাকুরদার আমলের। ভারি কাঁঠালকাঠের, পায়াগুলি কুমীরের আকারের, চোরা খুপরি দেওয়া, তার মধ্যে

অলিমাসিমা কুকুরদের সকালের খাবার জন্য লেড়ুয়া বিস্কুট রাখেন। অন্য কোনো রকম বিস্কুট এ বাড়িতে আর আসে না।

তক্তাপোশের ওপর রাশি রাশি টিন, বাক্স, কৌটো, হাঁড়ির মুখে হাঁড়ি বসানো। তক্তাপোশের নিচে সারি সারি বোয়েম, ঝুড়ি, বারকোস। তার ধুলো ঝাড়া হয়নি কতকাল। কেয়ার মাঝে মাঝে খেয়াল হয়, এক ঘণ্টার মধ্যে ঝেড়েমুছে সব ঝকঝকে করে দেয়। কিন্তু সে শুধু যেদিন খেয়াল হবে।

নেপু সব জিনিস চোখের সামনে দেখতে চায় ; কিছু তুলে রাখবারও জো নেই। বড় বড় কাঠের আলমারি ছুটোতেও আর চাবি পড়ে না। দরজা ধরে টানলেই ভেতরটার সবখানি দেখা যায়। চুরি করার লোকই নেই।

নেপু বলে, আমাকে যে ঠকাবে সে এখনো জন্মায়নি।

মনে করে অলিমাসিমার ঠোঁটের কোণে একটু হাসি লেগে থাকে। মোজাটা নিয়ে উঠে পড়েন, আলো নিভিয়ে, আস্তে আস্তে দরজার বাইরে চটিজোড়া খুলে রেখে, পাশের ঘরে যান। সেখানকার আলো জ্বেলে দরজাটি বন্ধ করে দেন।

অমনি সমস্ত ঘরখানি যেন ছু'হাত বাড়িয়ে অলিমাসিমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। এ-ঘরের মেঝেও ও-ঘরের মতোই পুরোনো মার্বেল পাথরের তৈরী, সাদা কালো বড় বড় ছক কাটা, কিন্তু একে কে যেন যত্ন করে পালিশ করে রেখেছে।

এখানকার চওড়া তাকের ওপর নেপুর বাবার ডিক্যাণ্টার থাকত, খাওয়া-দাওয়া হলে তার মধ্যে থেকে বিলিতী মদ ঢালা হত। নীল নক্সা-কাটা কি সুন্দর সব কাঁচের বাসন ছিল। সব নেপু ওপরে নিয়ে গেছে। আটটার সময় খাওয়া সেরে নেপু আর জামাই সেই যে দোতলায় ওঠে, আর নামে না। টেলিফোনটা খুলে সঙ্গে করে নিয়ে

যায় ; কেউ এলে দেখা করে না। সিঁড়ির মাঝখানকার ভারি লোহার দরজায় তালা লাগিয়ে দেয়।

নেপুর বড় চোরের ভয়।

নিচেটা তখন অলিমাসিমার রাজ্য হয়ে যায়। তবে কেয়া থাকে। কিন্তু কেয়া না থাকলে একটু ভয় ভয় করত হয়তো।

পাতলা, লম্বা, গোলাপী রেশমী মোজাটি যেন মাকড়সার জাল দিয়ে বোনা। নরম, মোলায়েম, শীতল। আঙুলের ফাঁক দিয়ে টানলে মনে হয় বুঝি জলের স্রোত হাতের মধ্যে দিয়ে গলে পড়ছে।

চৌত্রিশ বছর আগে নেপুর মা এ মোজাটা দিয়েছিল।

ধর্ অলি, এর মধ্যে টাকাটা সিকেটা জমিয়ে রাখিস। বিলেতে আমাদের ল্যাণ্ডলেডি রাখত।

এইরকম মোজা পায়ে দিত নেপুর মা, আর গোলাপী, সোনালী, রুপোলী, ছাই রঙের, সার্টিনের গোড়ালিতোলা জুতো। চকোলেটের বাক্সের ঢাকনির বিবিদের মতো দেখতে। রোজ পার্টিতে যেত নেপুর বাবার সঙ্গে।

গাড়ি-বারান্দার নিচে সাড়ে সাতটা থেকে আগে জুড়িগাড়ি দাঁড়িয়ে থাকত। তারপর মোটর কেনা হয়েছিল।

কি নামডাক ছিল নেপুর বাবার! সারা ভারতবর্ষ ঢুঁড়ে অমন আরেকটি ব্যারিস্টার পাওয়া দায় ছিল। বিলেত থেকে, বর্মা থেকে ডাক পড়ত। কি দামী-দামী সব উপহার নিয়ে ফিরত, দেখে সবার চোখ টাটাত।

দোতলার সামনের দিকের বড় ঘরটাতে নিচু আবলুসকাঠের টেবিলে তিন ফুট একটা আগাগোড়া রুপোর তৈরী গোলাপদানি ছিল। সেবার যখন রুপোর দাম বাড়ল নেপু সেটা সের দরে বেচে দিল। অবিশ্যি কি-ই বা হত রেখে? কেউ আসেও না আর এ বাড়িতে

নেমন্তন্ন খেতে। তাছাড়া ওসব ঘরে আজ দশ বছর ধরে নেপু ভাড়াটে বসিয়েছে। বড় বড় কামরাগুলোকে পার্টিশান দিয়ে খোপ খোপ বানিয়েছে। বড় উঠোনের জল নিয়ে তারা কি খেঁচাখেঁচিটা করে রোজ, সে না-শুনলে বিশ্বাস হয় না।

ছোট একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অলিমাসিমা আলো নিভিয়ে দেন। অমনি পুবের ছোট জানলা দিয়ে রাশি রাশি চাঁদের আলো ঢুকে ঘর ভরে দেয়। একটু সোঁদা গন্ধ নাকে আসে, জানলার নিচের কাঠের তক্তাটার ওপর ব্যাঙের ছাতার মেলা বসেছে। ছোট ছোট, গোল, লম্বা, চ্যাপটা ; ফিকে সব রং ; হলদে, ছাই, গোলাপী, পাটকিলে। কি রূপ তাদের ! অলিমাসিমা একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন।

হাতের মোজাটা যেন পাঁচ মণ ভারি হয়ে ওঠে। বাঁকা হয়ে চাঁদের আলো সাদা, সরু বিছানার ওপর এসে পড়েছে। অলিমাসিমা সেখানে পা ঝুলিয়ে বসেন, কোলের ওপর লম্বা গোলাপী রেশমী মোজাখানি পড়ে থাকে। পায়ের পাতাটা ঠাসা অলিমাসিমার সারা জীবনের সঞ্চয়।

পা টনটন করে। ধীরে ধীরে পা হুখানি তুলে খাটের ওপর আসনপিঁড়ি হয়ে অলিমাসিমা বসে থাকেন। মনে মনে আপনা থেকেই হিসেব কষা হতে থাকে। পুরোনো হিসেব, অলিমাসিমার মুখস্থ হিসেব, তবু রোজ একবার না আওড়ালেই নয়।

মাসে দশ টাকা হলে বছরে একশ কুড়ি টাকা। দশ বছরে বারো শ। কুড়ি বছরে চব্বিশ শ। চল্লিশ বছরে আটচল্লিশ শ। অলিমাসিমার চল্লিশ বছরের রোজগার। প্রথম হু বছর অলিমাসিমাকে হাতখরচ দেবার কথা কারো মনে হয় নি।

কিন্তু মোজায় আছে সাত হাজার টাকা। সত্তরটা পরিষ্কার এক শ টাকার নোট, ছোট করে আলাদা আলাদা ভাঁজ করা। একটাও

পুরোনো নয়, বারে বারে পোদ্দারের দোকান থেকে পালটিয়ে আনা। শেষটা কোনদিন না বলে বসে আজ থেকে বিলিতী আমলের নোট চলবে না।

কিন্তু সাত হাজারে তো হবে না। অবিশ্যি মাতুলির মধ্যে দিদিমার গজমতিটা আছে। তামার বড় একটা মাতুলি, কালো মোটা সুতো দিয়ে গলায় ঝোলানো। তার মধ্যে একটুকরো চাঁদের আলোর মতো গজমতি। শুক্তির ভেতরে যখন ছিল, তার চাইতেও অনেক বেশী নিরাপদ। ছোটবেলায় মার মুখে শোনা, ওর দাম কমপক্ষে তিন হাজার টাকা।

হল গিয়ে দশ হাজার।

অলিমাসিমার পিঠটা আপনা থেকেই সোজা হয়ে যায়। আর তুটি হাজার হলেই বর্ধমানের ফালি জমিতে অলিমাসিমার নিজের বাড়ি উঠবে। আমগাছের তলা বাঁধিয়ে পাতাবাহার বসানো হবে।

বটফলের দাদা করে দেবেন। নীল কাগজে নক্সা-টক্সা আঁকানো হয়ে গেছে, তার জন্যই পঁচিশ টাকা লেগে গেছে। বটফলের দাদা ভারি সাধু লোক। আর বটফল তো অলিমাসিমাকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালোবাসে।

ভালোবাসা ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে? আর বটফলের ভালোবাসার মতো ভালোবাসা কোথায় পাওয়া যাবে? ছেলেমেয়েই বল, বাপ মা ভাই বোন কিম্বা স্বামীই বল, সকলের ভালোবাসার পেছনে একটা বাধ্যবাধকতা থাকে, না বাসলে লোকে নিন্দে করে। কিন্তু বটফলের ভালোবাসা গঙ্গাজলের মতো বয়ে চলেছে।

অলিমাসিমা উইল করে রাখবেন। বাড়িটা জমিটা যেন বটফল পায়। দাদা নিশ্চয় ক্ষেপে যাবে। ওর বাড়ির লাগোয়া ঐ পোড়ো জমিটুকু কারো কোনো কাজে লাগছিল না। দিদিমা মরবার আগে

ওটি অলিমাসিমাকে দিয়ে গেছেন শুনে দাদা রেগে চতুর্ভুজ। বলে কিনা,

কি দরকারটা ছিল? এ যেন পাঁচজনকে বলে বেড়ানো যে আমার বিধবা ছোট বোনকে আমি একমুঠো খেতে দিতেও পারব না। অমন বোনের মুখ দেখি তো আমার—

যা-তা বলতে লাগল দাদা, ওর কথার কোনো কালেই কোনো ছিরি ছিল না।

মা বাবা অনেকদিনই গত হয়েছিলেন, শেষটা অলিমাসি আর টিকতে না পেরে ঠাকুরমশাইয়ের বাড়ি গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ঠাকুরমশাইয়ের নিজেরই দিন চলে না। নেপুর বাবা ঠিক সেই সময় বর্ধমান এলেন, ঠাকুরমশাইকে কি যেন বাৎসরিক দিতে হয়, তাই নিয়ে। দারুণ সাহেব মানুষ, মেজাজটিও দিল-দরিয়া। যেই শুনলেন অলিমাসিমা গ্রাম সম্পর্কে নেপুর মার বোন হন, অমনি তাঁকে ডানার তলায় আশ্রয় দিলেন।

অলিমাসিমার বয়স তখন পনরো বছর। সেও আজ বেয়াল্লিশ বছর হয়ে গেছে। মনে করতেও কেমন লাগে।

গির্জের ঘড়িতে একটা বাজল। আর রাত করাটা ঠিক নয়, কাল সকালে ছ'টার মধ্যে নেপুর আর জামাইয়ের চা-টোস্ট দিতে হবে।

কিন্তু মোজাটাকে তাহলে কোথায় রাখা যায়?

আজ আর ভাবা যায় না। মোজাটাকে বালিশের ওয়াড়ের ভেতর পুরে, বালিশটা মাথায় দিয়ে অলিমাসিমা শুয়ে পড়লেন।

যেই শুলেন, অমনি কানে আবার ঝাঁপতাল বেজে উঠল। কান ঝালাপালা হয়ে গেল। কানের মধ্যেই বাজে, না বাইরে কোথাও বাজে অলিমাসিমা ঠাওর করতে পারেন না। ঝাঁপতাল কাকে বলে

তাও জানেন না অলিমাসিমা, ভাবেন লুকিয়ে বাজে, গোপনে বাজে, এই তাহলে ঝাঁপতাল।

পরদিন রাত্রে কাঁটায় কাঁটায় রাত আটটার সময় নেপু আর জামাই রোজকার মতো এসে খেতে বসে। ঘরের মাঝখানকার তেপায়া বিশাল শ্বেতপাথরের টেবিলে অলিমাসিমা ওদের খাবার দেন।

অতি পুরোনো চীনেমাটির প্লেট দু'খানির ধারে ধারে গায় সবুজ রঙের বাড়িঘর গাছপালা আঁকা। নেপুর কোনো ধারণা নেই এগুলির কতো দাম। এর বড় ডোঙাটা অনেকদিন আলমারির নিচে পড়ে ছিল, তার ঢাকনিটা তাক গুছোতে গিয়ে হঠাৎ খুঁজে পাওয়া গেল। বটফল নিয়ে গিয়ে কোথায় কোন্ চীনের দোকানে পঁচিশ টাকা দিয়ে বিক্রি করে, আঁচলে বেঁধে টাকাগুলি অলিমাসিমাকে এনে দিয়েছিল। নেপু কিনা বলেছিল ঐ ডোঙা কুকুরদের সুরুয়া ঢাকবার জন্য রাখতে!

খেতে বসেই নেপু বললে,

বড় গোরু কি তাহলে দুধ দেওয়া বন্ধ করে দিল, অলিমাসি? গয়লাকে একবার ডাকো তো।

গয়লা এসে দোরগোড়ায় দাঁড়ায়।

বন্ধ করেনি, মা, মোটে পাঁচ সের করে দিচ্ছে। ছোট গোরু দিচ্ছে সাড়ে তিন সের। ঘাসবিচুলি কিনে, আপনাদের দুধটুকু জুগিয়ে আর কিছুই থাকছে না।

জামাই মুখ তুলে নরম সুরে বলে, জজসাহেবের বাড়িতে আর দেওয়া যাচ্ছে না তাহলে?

নেপু তীক্ষ্ণ গলায় বলে,

বেচে দাও ও গোরু। আগে তো দশ সের দিত। বরাবর দিত।

বাচ্চা বড় হয়ে যাচ্ছে, মা। তারপর তো একেবারে বন্ধই হয়ে যাবে। আবার নতুন বাছুর হলে পর—

জামাই বলে,

জজসাহেব খুশি থাকলে আমাদেরই সুবিধে, বুঝলে মঙ্গল? ঐ রোজ আড়াই সের দুধের জন্য, মাসে আমার কত আড়াই শ টাকা আসে। দেখো একটু দুধ বাড়াবার কি করতে পার।

নেপু বলে,

অলিমাসি, রোজ যে মাংস রাঁধছ, ফকরুল কত করে নেয়?

এক পো রাখি, এগারো আনা করে দিই। কিছুই খাও না, শরীর টিকবে কেন। জামাইকে খাটতে হয় কোর্টে।

নেপু তবু বলে, তাই বলে রোজ এগারো আনা! বেশী নিচ্ছে, অলিমাসি, ঘিও তুমি বেশী দিচ্ছ। স্টু-এর মতো রেঁধো, আমাদের বয়স হচ্ছে, হাল্কা খাওয়াই ভালো। আবার কলা কেন?

অলিমাসি বলেন, মার্কেটে মাংস তিন টাকা সের। আর কাঁদি থেকে ঐ এক ছড়াই তোমাদের জন্য কেটে রেখেছি, বাকিটা নকুড়বাবু নিয়ে গেছেন, কাল ভোরে বাজারে পাঠাবেন। কলা পুষ্টিকর, নেপু, খাও দুজনে দুটি। গাছের কলা, তোমার মা পুঁতেছিল প্রথম।

এমনিধারা রোজ হয়। মনে মনে নেপু আর জামাই যত্নটুকু পেয়ে খুশিই হয় বোধ করি। আর দুধ থেকে, কলা থেকে অলিমাসিমার আর গয়লারও কিছু কিছু ঘরে আসে। এই তো মোট সংসারটি। নেপু আর জামাই, অলিমাসিমা আর গয়লা। আর কেয়া। আগে সার সারি গুদোমঘর লোকজনে গমগম করত। বাবুর্চি, বেয়ারা, বামুনঠাকুর, কোচম্যান, সইস, সোফার, মেথর, গয়লা, ধোপা। যেন গোটা একটা শহর। দুটো মালী ছিল, সামনে ফুলের বাগান, পেছনে

সব্জি-বাগান। সামনের জমিটা তো নেপু বেচেই দিয়েছে, এখন আর বড় ফটক দিয়ে ঢোকাই যায় না, সেখানে বিরাট বাড়ি হয়েছে অন্য লোকের। পাশ দিয়ে লম্বা গলি পার হয়ে ভেতরে আসতে হয়।

অবিশ্যি খাবার ঘরের পেছনেই ছোট উঠোন, কল, চৌবাচ্চা, রান্নাঘর, গোয়ালঘর, গয়লার ঘর। উঠোনের উঁচু পাঁচিলে মজবুত খিড়কি দরজা। খিড়কি খুললেই অন্ধ গলি, অন্ধ গলির মুখে বটফলের বাড়ি। এ দিকের সবটা পাঁচিল ঘিরে আলাদা করা। বাকি গুদোমঘরে যত সব ভাড়াটে, রাশি রাশি ভাড়া গুণে দেয় তারা। শুধু ধোপারা ভাড়া দেয় না, তারা এ বাড়ির যাবতীয় কাপড় কেচে দেয়। নেপু কখনো কাপড়-কাচার সাবান কেনে না।

জামাই মার্কিনের ফতুয়া আর মোটা রঙিন লুঙ্গি পরেছে। নেপুর পরনে রং-জ্বলে-যাওয়া মান্ধাতার আমলের মাদ্রাজি শাড়ি, হয়তো বা নেপুর দিদিমার কেনা। এককালে বেগনি ছিল, এখন সেটা বোঝা যায় না। তবে নেপুরও তো বেগনি পরার বয়স গেছে।

নেপুকে কখনো কাপড় কিনতে হয় না। দোতলার বাক্সের ঘরে সারি সারি লোহার সিন্দুক ভরা চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট বছরের পুরোনো সব রেশমী শাড়ি, গয়না, বাসনপত্র। সেইসব পরে নেপুও মাঝে মাঝে জামাইয়ের সঙ্গে পার্টিতে যায়। পুরোনো বনেদী জিনিস দেখে সবাই খুব তারিফ করে। গাড়ি-বারান্দার নিচে পুরোনো মোটরগাড়িটা থাকে ; জামাই নিজে চালায় ; ফকরুলের ছেলে ধোয়ামোছা করে, জল ভরে দেয় ; তার জন্য ওদের গুদোম-ভাড়া কম করে দেওয়া হয়েছে।

নেপুরা ততক্ষণে উঠে পড়েছে।

ও অলিমাসি, কি ভাবছ কি ? শুনছ, কাল আর মাংস নিও না, মিস্টার সিনহার বাড়ি ডিনার। ওঁর ছেলেও ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে এল যে। ও! একটা মজার কথা বলতে ভুলে যাচ্ছিলাম। শুনলাম

বিলেতে ও নাকি আমাদের কেয়ার স্বামীর বাড়িতে পেয়িং-গেস্ট হয়েছিল।—আচ্ছা, কেয়া থাকে কোথায়, কদ্দিন দেখিনি যেন ?

অলিমাসিমা এতক্ষণে মুখ খোলবার সুযোগ পেলেন।

কি জানি, বাছা, ওদের কিছু বুঝি না। আপিস-ছুটি সাড়ে পাঁচটায়। ফিরতে হয় তার কোনোদিন দশটা, কোনোদিন আরো দেরী।

নেপুর গায়ের রং ধবধবে ফরসা, ভুরুর লেশমাত্র চোখে পড়ে না, যেন কখনো ভুল করে ধোপার বাড়ি গিয়ে ভাঁটিসেদ্ধ হয়ে এসেছে। চোখের পক্ষ্মগুলো অবধি ফিকে সোনালী, চোখে দেখা যায় না। অলিমাসিমা দেখলেন ওর গণ্ডদেশে ক্ষীণ একটু রক্তিমাভা দেখা দিল। ক্রুদ্ধকণ্ঠে সে বললে, করে কি এত রাত পর্যন্ত ? ওকে বলে দিও, এ বাড়িতে থেকে ওসব চলবে না। খায় কখন ? খাইখরচ দিচ্ছে আজকাল ? মাইনে পান তো এক শ ত্রিশ টাকা। দেয় কিছু ?

সত্যিকথাটা বলতে হয়। নেপু আরো রেগে যায়।

ওসব চাল দেখাতে মানা করে দাও। নয়তো অন্য কোথাও ব্যবস্থা করুক গে। গরীবের ঘোড়ারোগ দেখছি।

অলিমাসিমা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কিছু বললেই ও মেয়ে তৎক্ষণাৎ বাক্স গুছিয়ে চলে যাবে। একতলায় অলিমাসিমা একা থাকেন কি করে ? কথাটা নেপুর কানে না তুললেই হত। বলেন—

না, নেপু, কেয়া মন্দ মেয়ে নয়, ওদের আপিসে কি সব কেরানীদের মিটিং-ফিটিং হয়, ও তার এক পাণ্ডা, তাই দেরী হয়। কেউ না কেউ পৌঁছে দিয়ে যায়।

নেপু বলে—

কেরানীদের মিটিং ? কমিউনিস্ট ব্যাপার নয় তো ? শেষে এ বাড়িতে পুলিশ এনে ঢোকাবে না তো ? ওনার অর্ধেক কাজ হল সরকারি, শেষটা—

জামাই বাধা দিয়ে বলে, না, না, সেরকম কোনো ভয় নেই। আজকাল আইন অনেক পাল্টে গেছে, নেপু।

নেপু তবু বিরক্তভাবে বলে,

এইসব দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজনের জ্বালায় বাড়িতে দেখছি টেকা দায় হয়ে উঠল। নেপু কুকুরগুলোকে ডেকে নিয়ে, মাঝের ঘর থেকে টেলিফোনটা খুলে নিয়ে, ওপরে চলে যায়। সিঁড়ির মাঝেকার লোহার দরজাতে তালা পড়ার শব্দ কানে আসে।

দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজনই বটে। কেয়ার বাবা নেপুর মার আপন মামাতো ভাই। মনে পড়ে বেয়াল্লিশ বছর আগে নেপুর বাবা পনরো বছর বয়সের অলিমাসিমাকে নিয়ে এই ঘরেই ঢুকেছিলেন।

নেপুর মা লাট-মেমের মহিলাদের চা-পার্টি থেকে ফিরে, এইখানে বসে ছিলেন। তখন সব মখমলের গদি দেওয়া, পেছনে উঁচু ডানা লাগানো, ইঁটের মতো শক্ত, কালো কাঠের কারিকুরি করা দশটা বহুমূল্য চেয়ার দেয়ালের গায়ে সারি সারি ঠেস দেওয়া থাকত। খাবার সময় টেবিলের কাছে তুলে আনা হত। এই টেবিলটাই ছিল। ঠিক এই জায়গাতেই ছিল। আর সব বদলে গেছে।

এখন যেখানে তক্তাপোশ দুটি, সেখানে একটা প্রকাণ্ড কাঁচের আলমারি ছিল, রুপোর বাসনে বোঝাই। রোজ সে-সব ব্যবহার হত। আর ওধারে বিশাল একটা সাইডবোর্ড ছিল, তার তাকে থাকে থাকে কাঁচের বাসন থাকত। আরেকটা ছোট কাঁচের আলমারিও ছিল, তার তাকগুলি অবধি কাঁচের। তাতে নানান আকারের ছোট-বড় গেলাস থাকত।

নেপুর মার চেহারাটি মনে পড়ে। সুন্দরী বটে, তবে বড় বেশী ফরসা, কেমন যেন বর্ণহীনা। অবাক হয়ে চেয়েছিলেন অলিমাসিমার দিকে। নেপুর বাবা পরিচয় দিলেন।

রোগা শামলা একটি মেয়ে, না জানে সাজগোজ করতে, না জানে কথা কইতে। তেলচিটে চুলগুলো বেণী বেঁধে আঁটো করে খোঁপা করা। সাদামাটা, নিরাপদ। তবু নেপুর মা চুপ করে থাকেন। নেপুর বাবা বলেন,

তোমার এমনি একটি মেয়েরই দরকার ছিল, সোমা। কাছে কাছে থাকবে, কাপড়-জামার যত্ন করবে, সেলাই-টেলাই করে দেবে, দেখাশুনো করবে।

নেপুর মা বললেন, চুল বাঁধতে জানো ?

অলিমাসিমা তো অবাক। চুল বাঁধতে কে না জানে ?

হাল-ফ্যাশানের খোঁপা করতে পারবে ?

অলিমাসিমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল। তবে কি এই সুন্দর বাড়িতে থাকা হবে না ? আর কি ঐ সুন্দর মানুষটিকে দেখতে পাবে না ?

সুন্দর মানুষটি হেসে বললেন,

থাকত বর্ধমানে, ফ্যাশানের ও কি জানবে, সোমা ? কিন্তু সেজন্য ভেবো না। আমি বলে দেব, মিস গার্স্টিন নিজে এসে ওকে শিখিয়ে দিয়ে যাবে।

কর্কশকণ্ঠে সোমা বললে—

কিচ্ছু দরকার নেই। মিস গার্স্টিন এ বাড়িতে ঢুকলে আমি তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেব। আমিই ওকে শিখিয়ে নিতে পারব।

উত্তেজনায় নেপুর মার মুখ রাঙা হয়ে উঠল। তাঁর রূপ খুলে গেল।

নেপুর বাবা হেসে বললেন, তা হোলে তো আর কোনো ভাবনাই নেই।

নেপুর মা অলিমাসিমাকে কাছে ডাকলেন।

কি নাম তোমার? আমাদের গ্রামের হরিশকাকার মেয়ে তুমি? হরিশকাকা আছেন কেমন?

সব কথা বলা যায় না। অলিমাসিমা থেমে থেমে খানিকটা খানিকটা উত্তর দিলেন।

আহা, মুখ তুলে বল। তোমার নাম অলকানন্দা? বড্ড বড় নাম, তোমায় ডাকব অলি বলে, কেমন?

সেই অবধি অলিমাসিমা এ বাড়িতে থেকে গেলেন। শুধু থেকে গেলেন না, এ বাড়ির সুখদুঃখের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গেলেন যে এখানকার দরজা-জানলার মতো বাড়িটার একটা অঙ্গই হয়ে গেলেন।

দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজন বটে।

অলিমাসিমাকে নইলে নেপুর মার এক দণ্ড চলত না। দিনরাত অলি, অলি, অলি। এক মুহূর্ত বিশ্রাম ছিল না। অলিমাসিমা একেবারে নিষ্প্রয়োজনের অনাদর থেকে অতিপ্রয়োজনের সিংহাসনে চড়ে বসেছিলেন।

অলি, আমার ফুলকাটা গায়ের কাপড়টা দে। অলি, দেখ, এই লেসের এখানটায় একটু ছুঁচ চালিয়ে দিতে পারিস কিনা। অলি, আমার চন্দনকাঠের হাতপাখা পাচ্ছি না। অলি, স্নানে জলে গোলাপ-গন্ধ দিয়ে দে। অলি, চুল শুকিয়ে দে। অলি, এলো খোঁপা বেঁধে দে। অলি, আমার সঙ্গে গঙ্গার ধারে বেড়াতে চল। অলি, অলি, অলি, অলি।

পঁচিশ বছর বাদে ঐ অলির কোলেই মাথা রেখে স্বর্গে গেলেন।

অলি, চোখে দেখতে পাচ্ছি না কেন। অলি, একটু আলো করে দে। অলি, চারদিক অন্ধকার হয়ে আসে কেন। আলো দে, অলি। অলি!

ঐ একটিবারই শুধু অলিমাসিমা নেপুর মার কথা রাখতে পারেন নি। এই পঁচিশ বছরে ঐ প্রথম তুজনায় ছাড়াছাড়ি হয়েছিল।

তারপর সব চুকেবুকে গেলে, সাদা গোলাপ আর রজনীগন্ধার স্তপগুলিকে গুছিয়ে রেখে, অলিমাসিমা ওপরে নেপুর মার শোবার ঘরে গেছিলেন। নেপু তখন মার খাটে উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে চুপ করে শুয়ে ছিল। এই মিসেস সিনহার শাশুড়ী, বুড়ী মিসেস সিনহা, পাশে শুয়ে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন।

পাশে ছোট কাপড় ছাড়বার ঘরখানিতে অলিমাসির ছোট খাটখানি পাতা ছিল। ঘরময় কাপড়চোপড় ছড়ানো, দেরাজ খোলা, আল-মারিতে চাবি দেওয়া নেই। যত্ন করে প্রত্যেকটি জিনিস নিজের জায়গায় তুলে রেখে, ধোপার কাপড়ের ফর্দ করে গাঁটরি বেঁধে, চাবিগাছি অলিমাসিমা নেপুর হাতে দিয়ে দিয়েছিলেন। আলমারির দেরাজে হাজার হাজার টাকার গয়না এমনি পড়ে থাকত, তার একটিও খোয়া যায় নি। শুধু একান্ত নিজের প্রাপ্যটুকু ছাড়া, সব কিছু অলিমাসিমা পরিপাটি করে উঠিয়ে ফেলেছিলেন। শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বাড়িখানি নিকট আত্মীয়স্বজনে গিজগিজ করছে। বাইরে কিছু ফেলে রাখাটা ঠিক নয়।

বুকের মধ্যে একটা শূন্যতা বোধ হচ্ছিল। তার ওপর সোনার হারগাছি করকর করছিল। এটি অলিমাসিমার একান্ত নিজস্ব জিনিস। কতবার নেপুর মা বলেছিলেন, ওটি তোর এত ভালো লাগে, অলি? আমি ম'লে ওটি তোকেই দিয়ে যাব, যাঃ! বার বার হেসে হেসে কথাগুলি বলতেন। না হয় হাতে করে তুলে দিয়েই যান নি। তার সময়ই বা পেলেন কোথায়? সকালে মাথা ঘুরে পড়লেন, তুপুরের মধ্যেই হয়ে গেল। মালাগাছি অলিমাসিমার নয়তো কার?

ও মালার কোনোদিনও খোঁজ হয়নি। বহু বছর বাদে, সাড়ে তিন

শ টাকা দিয়ে বটফল বেচে দিয়েছিল। মোজার ভেতর সে-টাকাটাও আছে।

তোমার মার মালা, অলিমাসি? বেচতে মায়া করছে না?

মায়া? অলিমাসি পরের ঘরে চল্লিশ বছর বাস করেছেন। তাঁর আবার মায়া কি?

হ্যাঁ, তবে একটু মায়া আছে বইকি। দাদার বাড়ির লাগোয়া ঐ একফালি জমি, তার একধারে একটি আম গাছ। এতো দিনে সেই কলমের গাছটি নিশ্চয় দোতলার সমান উঁচু হয়ে উঠেছে। হিমসাগর আম। কালো মেঘের মতো ফল ধরে নিশ্চয়। দাদারা পেট ভরে খায়; তা খাক গে। দোরের কাছে অমন আম পেলে কে-ই বা ছেড়ে দেয়?

বেয়াল্লিশ বছর অলিমাসিমা ও-জমি চোখে দেখেন নি, তবু যেন চোখের সামনে ভাসে। দাদার জমি থেকে এক সারি ফণিমনসা দিয়ে আলাদা করা। দাদার বাড়ির পেছন দিকে চার কাঠা মাত্র জমি। দাদার কোনো কাজে লাগে না। অথচ তাই নিয়ে দাদা, কি কাণ্ডটাই না করেছিল। ঠাকুরমশাইয়ের স্ত্রী অবিশ্যি বলেছিলেন, সবই বৌয়ের মন্ত্রণায় করেছিল, কিন্তু অলিমাসিমা তো দাদাকে ভালো করেই চেনেন। চিরটা কাল ওর ঐ এক ভাবেই গেল। এখন কেমন আছে কে জানে? যদ্দিন ঠাকুরমশাই বেঁচে ছিলেন, মাঝে মাঝে পোস্টকার্ডে খবর দিতেন। তিনিও মারা গেছেন আজ কুড়ি বছরের বেশী। দাদাই বা বেঁচে আছে কিনা কে জানে?

অলিমাসিমা আঙুলে সময় গোনেন। দাদা হল গিয়ে দশ বছরের বড়। অলিমাসিমারই হল গিয়ে সাতান্ন বছর। দাদার তা হলে সাতষট্টি। সাতষট্টি কি আর এমন বয়স? দাদার ছেলেটার তখন ছ'বছর বয়স ছিল, সেই তবে এখন চুয়াল্লিশ বছরের।

ভারি আশ্চর্য লাগে অলিমাসিমার। সেই ছোট্ট ছেলেটা—কি যেন বলে ডাকত মনে পড়ছে না—ওটারই এত বয়স! কে জানে, তার চুলেও হয়তো পাক ধরে গেছে।

দেয়ালে ঝোলানো দাগ-ধরা বড় আয়নাটার দিকে অলিমাসিমা চেয়ে দেখেন। সাদা কাপড় পরা আরেকটা অলিমাসিমা তাঁর দিকে গম্ভীর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। অলিমাসিমা অবাক হয়ে তাকে দেখেন। কেমন যেন অচেনা অচেনা মনে হয়। মোটাসোটা, বেঁটে, শামলা রং, কানের পাশের চুলগুলি সব সাদা হয়ে গেছে, থুতনির তলাকার মাংসটা কি রকম ঢিলে দেখায়। অলিমাসিমার ভারি আশ্চর্য লাগে।

হাসিও পায়। জমির কিন্তু অদলবদল হয় না সহজে। যদি না তার ওপর ছোট একখানি বাড়ি তোলা যায়। দুপাশে দুটি শোবার ঘর, স্নানের ঘর, মাঝখানে ছোট হল ঘরখানি, পেছনে রান্নাঘর, তার পাশে আরেকটা খুপরি ঘর, সামনে বারান্দা। বটফলের দাদার নক্সাতে সব আঁকা আছে। আমগাছটি পড়বে বারান্দার সমুখে। তার গোড়া ঘিরে পাতাবাহারের গাছ বসানো থাকবে। অলিমাসিমা বারান্দায় ডেক-চেয়ারে বসে বসে দেখবেন। এদিক থেকে দাদার বাড়ি দেখা যাবে না, পেছন দিক দিয়ে যাওয়া-আসা হবে। ও ঘরটা, স্নানের ঘরটা, রান্নাঘরটা ভাড়া দিয়ে, অলিমাসিমা নিজের খরচটা চালাবেন। খুপরি ঘরে তোলা উনুনে রাঁধাবাড়া করবেন। কোনো কষ্ট হবে না, তোলা উনুনে অলিমাসিমা আজ পনরো বছর রেঁধে আসছেন।

রান্নাঘরের বড় চুল্লীতে আঁচ দেওয়া হয় না। বড় কয়লা পোড়ে। তোলা উনুনে কাঠকয়লাতে অলিমাসিমা তিনটি প্রাণীর রাঁধাবাড়া করেন। ঝাড়াঝাপটা খাওয়া, একটা তরকারি, একটা মাছ, আতপ চালের ভাত। নেপু ডাল বন্ধ করে দিয়েছে, চার আনা সেরের ডাল

তেরো আনা হয়েছে। রাতে মাংস, হাত-রুটি, বেগুন-ভর্তা, ঘন দুধ, এই রকম। খাবার ঘরের কোণায় ইলেকট্রিক হিটার আছে, তাতেও কিছু কিছু হয়। কে এক মক্কেল ওটা দিয়েছিল, সস্তা করে লাইন বসিয়ে দিয়েছিল। অলিমাসিমারই সুবিধে। নেপু তো আজকাল আর এদিকে ঐ খাবার সময়টুকু ছাড়া আসেও না। কুকুরদের জন্য হাড়, ছাঁট ফকরুল এমনি দেয়; সেও হলুদ দিয়ে হিটারে সেদ্ধ হয়।

সারাক্ষণ নেপু ওদের লেডিজ কমিটির অনাথাশ্রমের জন্য বোনে। ওরা জামা পিছু এক টাকা করে দেয় আর পশমের দাম দেয়, বলে পাড়ার মেয়েদের দিয়ে করিয়ে নিতে। তবে নেপু নিজেই অনেকগুলি বুনে ফেলে, পয়সাটা কিছু ফেলে দেবার জিনিস নয়। আর অলি-মাসিমা কিছু বুনে দেন, টাকাটা তাঁরো কাজে আসে। বটফলকে দিয়েও দু-চারটে বুনিয়ে নেন, সে আর ওঁর কাছ থেকে পয়সা নেবে না, বরং কিছু করে দিতে পারলেই কৃতার্থ হয়। টাকার কথা বলে অলিমাসিমা ওকে কখনো অপমান করেন নি। কে বুনল নেপু জিগ্যেসও করে না, জামা পিছু এক টাকা ধরে দেয়, পশমের হিসেব বুঝে নেয়। নইলে লেডিজ কমিটির কাছে লজ্জায় পড়তে হবে। নেপুর স্বভাবটি ভারি সৎ। মানুষ মন্দ নয়। আর সত্যি কথা বলতে কি, নিজের পয়সা সে নিজে খরচ করল কি তুলে রাখল, কার তাতে কি এসে যায়? কারো কাছে তো আর চেয়ে আনে নি।

দরজা খুলে কেয়া আসে। মুখখানি কেমন ম্লান দেখায়। অলি-মাসিমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হেসে বলে,

এই দেখ, কেমন আমার স্বভাব শুধরে গেছে, রাত সাড়ে ন'টা না বাজতেই, বাড়ি এসে হাজির হয়েছি। বড় বড় হিঙের কচুরী আর আলুর দম এনেছি, মাসি খাও আমার সঙ্গে।

শালপাতার ঠোঙাসুদ্দু অলিমাসির হাতে তুলে দেয়, চোখের দিকে চেয়ে হাসে। অলিমাসিমা আর নেপুর কথাগুলি ওর কানে তোলেন না। যা মেয়ে, এখুনি হয়তো বাক্স গুছিয়ে অন্ধকার রাতেই বেরিয়ে যাবে। তখন অতগুলো টাকা নিয়ে অলিমাসিমা একতলায় একা থাকবেন কি করে?

লম্বা রেশমী মোজাটাকে হাতে ধরে থাকতে ভারি ভালো লাগে। রোজ নতুন জায়গায় লুকিয়ে রাখতে হয়। এ এক ভাবনার কারণ হয়ে উঠছে। কোথায় পাবেন অলিমাসিমা নিত্যি নিত্যি নতুন জায়গা? ফিরে ফিরে আবার পুরোনো জায়গাতেই রাখতে হয়। পোস্টাপিসে জমা দিয়ে দিলে ল্যাঠা চুকে যায়। কিম্বা ব্যাঙ্কে। ও বাবা, ব্যাঙ্ক যদি ফেল করে। নেপুর মা'র বাপের বাড়ি থেকে পাওয়া পাঁচ হাজার টাকা ঐভাবে জলে গেছিল। নেপুর মা হেসে হেসে সে কথা অলি-মাসিমাকে জানিয়েছিল। তবে পোস্টাপিস তো আর উঠে যাবে না। কিন্তু জানাজানি হবে। কেউ হয়তো জিগ্যেস করে বসবে কোথায় পেল অলিমাসিমা অতগুলো টাকা। চল্লিশ বছরে আটচল্লিশ শ যার রোজগার, সে জমায় কি করে সাত হাজার? কাপড়টা, গামছাটাও তো নেপুর মা গিয়ে অবধি নিজেকে কিনতে হয়েছে; তা হলে টাকাটা না কমে বেড়ে গেল কি করে?

অলিমাসিমার মুখখানি কঠিন হয়ে ওঠে। এমনি এমনি বাড়ে নি। প্রাণপাত করে বাড়িয়েছেন, এক টাকা দু টাকা পাঁচ টাকা দশ টাকা করে বাড়িয়েছেন। শুধু একবার হাতে হাতে একেবারে এক শ টাকা পেয়ে গেছিলেন লটারি জিতে। সেও বটফল টিকিট কিনে দিয়েছিল। জোর করে অলিমাসিমার জন্মদিন উপলক্ষে

এক টাকার টিকিটখানি কিনে এনে উপহার দিয়েছিল। পাড়ার মেয়েরা সবাই কিনেছিল, যে যেমন করে পারে পয়সা যোগাড় করে। কিন্তু টাকাটা উঠল অলিমাসিমার কপালে। বটফল সত্যি খুশি হয়েছিল। অবিশ্যি ওর কাছেও অলিমাসিমা কোনোরকম ভাবে ঋণী থাকতে চান নি, তাই টিকিটের দাম একটা টাকা জোর করে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। বটফল বোধ হয় একটু দুঃখিতই হয়েছিল। তাই দিয়ে সন্দেশ কিনে সবাইকে খাইয়েছিল। তখনকার দিনে এক আনায় বেশ বড় একটা চিনি-সন্দেশ পাওয়া যেত। এই নিয়ে বিজুর মাসি-টাসিরা নাকি নানান মন্তব্য করেছিল আড়ালে গিয়ে। তবে সেটা হওয়াই স্বাভাবিক, কারো ভালোটা তো লোকে সইতে পারে না।

মাদুলিটার মধ্যে থেকে গজমতি বের করা ভারি শক্ত। গালা দিয়ে মুখটা এঁটে নিয়েছেন অলিমাসিমা। মাঝে মাঝেই সুতোটা বদলাতে হয়, কি জানি কোনোদিন যদি ছিঁড়ে পড়ে যায়। মনে করলেও গা শিউরে ওঠে। মাদুলি খুলে ভালো করে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেন গলাটা আল্গা হয়ে এসেছে, মুখটা ঢিলঢিল করছে। ভাগ্যিস মনে হল, নইলে আরেকটুকু হলেই তো সর্বনাশ হয়ে যেত! রাঁধতে গিয়ে তো আগুনেই পড়ে যেতে পারত। এক নিমেষে তিন হাজার টাকা দামের গজমতি পুড়ে ছাই হয়ে যেত।

আস্তে আস্তে মাদুলি খুলে মুক্তোটা হাতের চেটোয় ঢাললেন অলিমাসিমা। এটা মা'র ছিল। মা'র মুখটা ভালো মনে পড়ে না, বড়ই অকালে গেছিলেন। শুধু এইটুকু মনে পড়ে মা-ই মাদুলিতে ভরা গজমতিটা অলিমাসিমাকে দিয়েছিলেন। কাউকে কিছু বলতে মানা করেছিলেন। বাবার হাতে পড়লেই তো মদ খেয়ে উড়িয়ে পুড়িয়ে দিতেন। অলিমাসিমাকে আর পেতে হত না। আর দাদা? অলিমাসিমার হাসি পায়।

একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন হাতের চেটোয় গজমতিটার দিকে। যেন একটুকরো চাঁদের আলো। তিন হাজার টাকা দিয়ে এটাকে যখন বেচে দিতে হবে, অলিমাসিমার ছুটো পাঁজরা খসে যাবে। কিন্তু ঐ তিন হাজার না হলে তো বাড়িও হবে না।

ওকি মাসি!

দারুণ চমকে ওঠেন অলিমাসিমা। মুক্তোটা হাত থেকে পড়ে তক্তাপোশের তলায় গড়িয়ে যায়। অলিমাসিমার হাত-পা হিম হয়ে যায়, বুকের ধুকধুকিও বুঝি থেমে যায়।

কেয়া নিচু হয়ে তক্তাপোশের তলা থেকে মুক্তোটা বের করে। ছু আঙুলে তুলে ধরে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। কেয়ার আঙুলগুলি পদ্মফুলের পাপড়ির মতো, কেয়ার চোখের কোলে গভীর ক্লান্ত ছায়া। কেয়ার মুখে কথা সরে না।

অলিমাসিমাই কথা বলেন।

আমার মা'র ছিল, কেয়া। ঐ একটি জিনিসই রাখতে পেরেছিলেন, নইলে বাবা সব মদ খেয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। ঠাকুরদার জমিদারির কিছু রাখেন নি। মা নিজের গয়নাগুলি লুকিয়ে রেখেছিলেন; খোসামুদি করে, ভয় দেখিয়েও যখন বাবা আদায় করতে পারতেন না, তখন আমাকে শূন্যে তুলে ধরে নাকি ঠাস ঠাস করে চড় মারতেন। আমার কিছু মনে নেই, কেয়া, ঠাকুরমশাইয়ের স্ত্রীর কাছে পরে শুনেছিলাম। আমার গায়ে নীল নীল দাগ পড়ে যেত, আর আমার মা'র চোখ দিয়ে বৃষ্টির ধারার মতো জল পড়ত। গয়না না দিয়ে করেন কি! শুধু মাছুলিতে পোরা এই মুক্তোটার কথা বাবাও জানতেন না। এটা আমাদের বংশের লক্ষ্মীর মাছুলি। ঠাকুমা মাকে রাখতে দিয়েছিলেন, মা মরবার আগে আমাকে দিয়েছিলেন। কাউকে কখনো বলিনি এর কথা।

কি জানি কেন অলিমাসির চোখের জল বাধা মানে না। কেয়া কাছে এসে বলে,

কই মাদুলী, মাসি, দাও আবার পুরে দিই।

কেয়ার হ্যাণ্ডব্যাগে গালা থাকে। মোমবাতির টুকরো থাকে। দেশলাই থাকে। কেয়াই মাদুলির মুখ বন্ধ করে, অলিমাসিমার হাতে দেয়। অলিমাসিমার হাত এত কাঁপে যে, কেয়াই মাদুলিটা গলায় গলিয়ে দেয়।

ওঠ মাসি, খিদে পেয়েছে, খাবার এনেছি, একটু গরম করে দাও।

কেয়া হাতমুখ ধুতে যায়। অলিমাসিমা উঠে দাঁড়ান। ঠুক করে মোজাটা কোল থেকে খসে মাটিতে পড়ে যায়। অলিমাসিমার সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে। ভাগ্যিস কেয়ার চোখে পড়ে নি। নাঃ, এখানে ওখানে না রেখে, নিজের ছোট ঘরখানির ওপরের তাকে, টিনের কৌটোয় ভরে রাখাই ভালো। ঐসব পেরেক আর তার আর আলপিনের কৌটোর মধ্যে কে খুঁজতে যাবে!

অলিমাসিমা নিজের ঘরে গিয়ে, ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে, মোজাটা লুকিয়ে রাখেন। কেয়াকে অতগুলো কথা না বললেই হত। কি জানি কেয়ার হাতে মুক্তোটা দেখে মনের ভেতরটা হঠাৎ কেমন দুর্বল হয়ে গেছিল। তবে বাবা-মা'র কথাটা না বললেই হত। নেপুর মাকে পর্যন্ত কোনোদিন বলেন নি। কি জানি। তবে কেয়া যে-রকম অহঙ্কারী মেয়ে, ও যে কাউকে বলবে না সেটা ঠিক।

কেয়া চীনে খাবার এনেছে। মোড়ের মাথার চীনে হোটেল থেকে। অলিমাসিমা বরাবর নিরামিষ খেয়ে এসেছেন, কিন্তু এদানীং কিরকম হাত-পা ঝিমঝিম করে, বটফল বলে মাছ মাংস ডিম একটু একটু খান, নইলে কোন্‌দিন মাথা ঘুরে পড়বেন। ডিস্পেন্সারির ডাক্তারও সেই কথাই বলেছিল। বটফল আরো বলে, বালবিধবা আপনি,

কোনোদিন স্বামীর ঘরই করলেন না, আপনি আবার বিধবা নাকি, আমরা আপনাকে কুমারী বলি।

বটফলরা খৃশ্চান। পাঁচপুরুষের খৃশ্চান, ভারি ভালো ওদের চালচলন। একদিন ওদের বাড়ি গিয়ে প্রায় ভির্মি গেছিলেন অলিমাসিমা। বটফলের বৌদিদি, সে পাসকরা নার্স, সে-ই প্রথম বলেছিল ও কথা। তখন অলিমাসিমার মাথাটা এমন ঝিমঝিম করছিল যে, ওরা কি বলছিল সবটা ঠিক ঠাহর হয় নি। এমনি মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিলেন। তখন বটফল চামচে করে গরম গরম কিসের সুরুয়া খাইয়ে দিয়েছিল। মনে হয়েছিল শরীরে বুঁঝি প্রাণটা ফিরে এল। এই অলিমাসিমার প্রথম আমিষ খাওয়া। ছোটবেলাকার কথা অবিশ্যি আলাদা, সে স্বাদও মনে নেই।

তবু বাড়িতে নিরামিষই খেতেন, কেমন লজ্জা লজ্জা করত। নেপু কথাটা ঠিক বুঝবে না, এটা অলিমাসিমা জানতেন। তাছাড়া খরচ বাড়ানোর কথায় নেপু কখনই মত দেবে না। কি সব বাজে কথা ভাবছেন অলিমাসিমা, বটফলরা জোর করে খাওয়ায়, তাই। নইলে কবে আর উনি আমিষ খেয়েছেন? ওরাই মাঝে মাঝে এটা ওটা এনে খাইয়ে যায়। খুব গোপনে, কারণ হিন্দুদের গোঁড়ামির কথা ওদের অজানা নয়। এমন কি বটফলের বুড়ী মা ফোকলা মাড়ি বের করে বলেন, অত কি গা? তুই বরং খিশ্চান হয়ে যা। সবাই কেন যে খিশ্চান হয় না ভেবে পাইনে। কত সুবিধে।

বটফল ব্যস্ত হয়ে ওঠে। থাক, থাক মা, তোমাকে আর এর মধ্যে নাক গলাতে হবে না।

এসব কথা অবিশ্যি কেয়ারও জানার নয়। কিন্তু বোধ হয় জানত। নইলে অত জোর করে চীনে খাবার খাওয়াবার সাহসটা পেল কোথায়? তবে কেয়ার সাহসের শেষ নেই।

উঠোনের কোণায় কলঘর থেকে অলিমাসিমা হাতে মুখে জল দিয়ে এলেন। দুজনায় চীনে খাবার খেলেন। খোলাখুলি খাবার ঘরে বসেই খাওয়া হল। রাতে কেউ আসে না এদিকটাতে। সব কাজ অলিমাসিমা একা করেন। শুধু শঙ্কর এসে দুবেলা ঘরদোর মুছে দিয়ে যায়। আগে অলিমাসিমা মেথরের ছেলেকে চৌকাঠ মাড়াতে দিতেন না। কিন্তু বছর দুই ধরে কি যে হয়েছে, নিচু হওয়া বড় কষ্ট। তবে নিজের ঘরখানিতে অলিমাসিমা ছাড়া কেউ যায় না। কেয়াও না। এমনই অহঙ্কারী মেয়ে যে যেতে চায়ও না।

খেতে বসে কেয়া বেশী কথা বলে না, কেমন যেন অন্যমনস্ক; অলিমাসিমা বেঁচে যান। তখন ও দুর্বলতাটুকু প্রকাশ না করলেই হত। মা তো কবে মরে গেছে। মুখটাও কেমন মনের মধ্যে আবছায়া হয়ে এসেছে। এত কথা বটফলও জানে না। কেয়াকে বলে ফেলে অলিমাসিমা লজ্জা বোধ করেন।

কিন্তু কেয়া শুধু তার আপিসের গল্পই করে। ছোটসাহেব তাঁর পিওন দিয়ে বাড়ির কাজ করিয়ে নেন। পিওনরা কেয়াকে দিয়ে তাঁর নামে বড়সাহেবের কাছে লম্বা লম্বা চিঠি লেখায়। কেয়া সব কথা অবিশ্যি লেখে না, তা হলে আর ওদের কারো চাকরি থাকত না। ওদের গরম গরম কথার সঙ্গে কেয়া দুধ-চিনি মিশিয়ে দেয়। তাতে চিঠির কোনো ফল দেখা যায় না, কিন্তু চাকরিগুলো টিকে যায়। আপিসের গল্প শুনতে শুনতে মাঝখানে হঠাৎ অলিমাসিমা জিজ্ঞেস করে বসেন,

ঐ পিওনরা কত করে মাইনে পায়, কেয়া ?

কেয়া যেন অবাক হয়। মাইনে ? তা এদিক ওদিক নিয়ে আশী-টাশী হবে বোধ হয়। ওরাও ইউনিয়নের মেম্বার, মাসে মাসে সব আট-আনা চাঁদা দেয় ক্লাবে। বাবুদের চাঁদা বাকি পড়লেও, ওদের কখনও পড়ে না।

পিওনরাও আশী টাকা মাইনে পায়! আশীকে বারো দিয়ে গুণ করলে কত হয়?

খাওয়া সারা হয়েছে অনেকক্ষণ, অলিমাসিমাকে চিন্তিত দেখে কেয়াই উঠে, ঘরের কোণে হাত ধোয়ার বেসিনে বাসনগুলি সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলে। ঝাড়ন দিয়ে মুছে তাকে তুলে রাখে।

অলিমাসিমার কাছে এসে বলে,

চলি মাসি, কাল সকালে ছ'টায় বেরুব, কাজ আছে, ও-পাড়া যেতে হবে। এত কি ভাব বল তো?

অন্যমনস্ক ভাবে অলিমাসিমা মাথা নাড়েন। অঙ্ক তেমন মাথায় আসে না আজকাল। কিন্তু বর্ধমানের প্রাইমারী স্কুলে অলকানন্দা সর্বদা অঙ্কে ফার্স্ট হত। চট করে নামতাও মনে পড়ে না আজকাল। আট বারোং ছিয়ানব্বই। এক বছরে পিওনরা পায় ন শ ষাট টাকা। দু হাজার তুলতে দু বছরের একটু বেশী। অলিমাসিমার হলে লাগত দু বছরেরও কম।

মনটা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কি জানে ঐ পিওনরা? কেয়াকে দিয়ে চিঠি লেখায়। দু হাজার টাকা তুলতে অলিমাসিমার লাগে কতদিন? সাত হাজার জমাতে লেগেছে চল্লিশ বছর। তবে আগের চাইতে আজকাল তাড়াতাড়ি জমে। তবু দু হাজার জমাতে হয়তো দশ বছর লাগবে। দশ বছর। অলিমাসিমারও ততদিনে সাতষট্টি বছর বয়স হয়ে যাবে। হয়তো বাঁচবেন না অতদিন।

সমস্ত মনটা বিদ্রোহ করে। টাকা রোজগার করা এত সহজ, অথচ দু হাজার টাকা জমাতে অলিমাসিমার লাগবে দশ বছর? জামাই এক একটা কেসে এক এক বার নাকি পাঁচ সাত শ পায়। নেপুর বাবা—না, সে আর কি দিয়ে গেছে অলিমাসিমাকে!

অলিমাসিমার চোখ ফেটে জল আসে। বটফলের কথা মনে হয়।

বটফলের বৌদি যে নার্স, সে নাকি মাসে দু শ টাকা পায়। তবে সে চার বছর ধরে পড়ে, পাস দিয়েছে, তবে না! কিন্তু বটফল নিজে? কি-ই বা তার বিদ্যে? অলিমাসিমার চাইতে হয়তো দু চার ক্লাস বেশী। কিন্তু সেও পাসটাস করেনি। কাজকর্মও অলিমাসিমার কাছ থেকেই শিখে যায়। অথচ ক্যান্টিনে সেও পঁচাত্তর টাকা মাইনের কাজ করে। ছোট ছেলেটাকে স্বামীর কাছে রেখে, রোজ কাজে যায়। নিজের একটা রোজগার না থাকলে চলে কখনো? স্বামী নিয়ে, ছেলে নিয়ে বাপের বাড়িতে থাকবে, অথচ কিছু খরচ দেবে না, তা কি হয় কখনো?

বটফল বলে, আপনিও চলুন আমাদের ক্যান্টিনে কাজ করবেন। আপনাকে পেলে ওঁরা লুফে নেবেন। ভার নেবার জন্য লোক খুঁজছেন, এক শ টাকা কি তার চাইতে বেশী দেবেন।

বটফলের মা ফোকলা মাড়ি বের করে বলেন, ও কাজ করবে না, মাগো! হিঁদুরা বড়লোক আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে থাকতে লজ্জা পায় না, চাকরি করতে লজ্জা পায়। ও আমি ঢের দেখেছি।

বটফল বলে,

মা, তুমি থামো তো। পরের ব্যাপারে নাক গলিও না।

কিন্তু ক্যান্টিনের ঐ কাজে যথেষ্ট সম্মান আছে, একেবারে মাথার কাজ। বছর দুই-এর বেশী করতেও হবে না।

শুধু দুটি বছর। কিন্তু তা হলে এখান থেকে চলে যেতে হবে। বেয়াল্লিশ বছর পর এ-বাড়ি ছাড়তে হবে। এ বর্ধমানের সেই ফালি জমিতে যাওয়া নয়। সেখানে তো অলিমাসিমার মন চল্লিশ বছর ধরে বাসা বেঁধে আছে। সে তো নতুন জায়গা নয়।

ক্যান্টিনে কাজ করলে আর নেপু এখানে থাকতে দেবে না, আর থাকবেনই বা কেন তিনি? কিন্তু কোথায় যাবেন অলিমাসিমা?

কোথাও যাওয়া মানেই তো খরচ। দু-বছরের জায়গায় তিন বছর। তবে খরচ দিয়ে তো বটফলের বাড়িতেও থাকা যায়, ওরা একটা ঘর ভাড়া দেয়। হোক না তিন বছর। তিন বছর আর এমন কি। কালই যাবেন বটফলের বাড়ি—

কি একটা শব্দ কানে আসে, হুড়দাড় করে কে সিঁড়ি বেয়ে নামছে না? তালা খোলার শব্দ, ঝড়ের মতো নেপু এসে ঢোকে,

অলিমাসি, শিগ্‌গির এসো, উনি কেমন কচ্ছেন!

কেয়াও উঠে এসেছে। বহুদিন পরে অলিমাসিমা দোতলায় ওঠেন। গত তিন বছর ধরে দোতলায় কারো ওঠা নেপুর পছন্দ নয়। সেখানকার সব কাজ সে নিজের হাতেই করে। অবিশ্যি গুটিতিনেক ঘর রেখে আর সবটা সামনের অংশের মত ভাড়া দেওয়া। সেদিকটার সঙ্গে কোনো যোগাযোগই নেই। বড় শোবার ঘর, কাপড়ছাড়ার ঘর, স্নানের ঘর আর বাক্সের ঘর। বড় শোবার ঘরের খাটে জামাই অচেতন হয়ে পড়ে।

অলিমাসিমার মাথা বড় ঠাণ্ডা। কেয়াও যেন একটু ঘাবড়ে গেছিল। তবু অলিমাসিমার নির্দেশে সে-ই ফোন করে ডাক্তার ডাকল। অলিমাসিমা জামাইয়ের মাথায় জলপটি দিতে থাকলেন। নেপু মুখ গুঁজড়ে কোণার সোফাটায় পড়ে থাকল।

রক্তচাপের পুরোনো রুগী, ডাক্তার এসে ওষুধ-পত্র, খাওয়া-দাওয়ার কথা বললেন। আগেই সাবধান হওয়া উচিত ছিল, যাই হোক, সে-রকম কিছু হয়নি এবার। পাঁচ-সাত দিনেই সম্ভবতঃ ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এগুলো হল প্রকৃতির ওয়ার্নিং। এখন থেকে খুব সাবধানে চলাফেরা।

নেপু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে, ডাক্তার চলে গেলে অলিমাসিমার কোলে মাথা রেখে খুব খানিকটা কেঁদে নেয়। কেয়া ক'দিন ছুটি নেয়, রাঁধাবাড়া করে দেয়, হিটার জ্বেলে। বলে, উনুন-টুনুন ঠেকাতে

পারবে না। নেপু বলে, মিটারে বেশী উঠবে। কেয়া বলে, কি বেশী উঠবে, নেপুদি, কত বেশী উঠবে? সে দিয়ে দেওয়া যাবে। তোমার তো মেলা টাকা।

নেপুর এ-ধরনের কথা ভালো লাগে না। তাছাড়া কেয়ার কোনো আচরণই বিয়ে-হওয়া মেয়ের মতো নয়। সিঁদুর পরে না, মাথায় কাপড় দেয় না, ডাক্তারের সঙ্গে হেসে-হেসে কথা বলে, দৌড়ে-দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে ওঠে-নামে, যা মুখে আসে বকে। যেন সমানে সমানে।

জামাই একটু সুস্থ হয়ে, বালিশে ঠেস দিয়ে উঠে বসলে, কেয়া একদিন ঘরদোর গুছিয়ে দিল। খাটের তলা থেকে রাশি-রাশি খালি বাক্স, টিন, ছেঁড়া জুতো বের করে, বিক্রিওয়ালা ডেকে সতরো টাকার জিনিস বিক্রি করে, নেপুর হাতে টাকা দিল। নেপু বললে,

মোটে সতরো টাকায় না দিলেও পারতে, কেয়া। অন্য লোকে হয়তো আরো বেশী দিত।

কেয়া অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

খাট থেকে জামাই হেসে বলে,

কিচ্ছু বেশী দিত না, নেপু। আজ পর্যন্ত কোনোদিনও সতরো টাকার রাবিশ বিক্রি করতে কাকেও দেখিনি। ওর অর্ধেকটা তো আমার মতে কেয়ারই প্রাপ্য। এ ঘরে কি দেখছ কেয়া, তোমার নেপুদির কাপড়-ছাড়ার ঘর যদি দেখ—

কর্কশ কণ্ঠে নেপু বলে,

ও-ঘরে তোমার যাবার কোনো দরকার নেই, কেয়া। তুমি সবটাতে বড্ড বাড়াবাড়ি কর—

কেয়া হেসে বলে, না নেপুদি, তোমার কোনো ভয় নেই, তোমাকে না বলে আমি কিচ্ছু করব না।

কেয়া নিচে চলে যায়।

জামাই বলে, কিছুই হয়নি নেপু, মিছিমিছি রাগারাগি করলে।

নেপু আরো রেগে যায়।

না, কিছু হয়নি। তোমার কথার মধ্যে কেয়ার সামনে আমাকে ছোট করার ইচ্ছে ছিল না! ও-রকম করে ওকে মাথায় তুলো না বলছি।

জামাইও ছাড়ে না।

কি বাজে কথা বল, নেপু। অযোগ্য সব কথা।

নেপু সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

হ্যাঁ, অযোগ্য কথাই তো! আমি এখন অযোগ্য না তো কি!! সব পুরুষ মানুষরা এক রকম, বুড়ো হলেও বদলায় না! ঐ নির্লজ্জ বেহায়া মেয়েটাকে আস্কারা দিচ্ছ কিসের আশায়?

জামাই হঠাৎ রেগে যায়—যা মুখে আসে তাই বল, নেপু? ও না আমাদের মেয়ের মতো, এইখানেতে মানুষ, এতটুকু মা-মরা মেয়ে এসেছিল, তোমার বাবার আশ্রয়ে মানুষ হল, এখান থেকে বিয়ে হল, আবার নিরাশ্রয় হয়ে এখানেই ফিরে এল। তোমার কি হৃদয় বলে কিছু নেই, নেপু? তাই ভগবান তোমাকে ছেলেমেয়ে দেননি।

উত্তেজনায় জামাইয়ের মাথা ঝিমঝিম করে, বুক ধড়ফড় করে। অলিমাসিমা ছোট্ট কালো শিশি থেকে পঁচিশ ফোঁটা ওষুধ গুনে খাইয়ে দেন। নেপুও ঘাবড়ে গিয়ে তখনকার মতো চুপ করে। পরে অলিমাসিমার কাছে কান্নাকাটি করে। অলিমাসিমা বলেন,

অমন কথা কি কেউ বলে, নেপু? জামাইয়ের দেবতার মতো চরিত্র, সে কি তুমি জানো না?

কাঁদলেই নেপুর চোখ ফুলে যায়, নাক লাল হয়ে ওঠে। ঢোক গিলে বলে,

সব আমার এলোমেলো হয়ে আছে, অলিমাসি, কি বলতে কি বলি তার ঠিক নেই। কিন্তু ও-মেয়ের হাব-ভাব দেখলে গা জ্বলে যায়, অলিমাসি, সব সময় অমন ঢলে-ঢলে পড়ে, ও কি খুব ভালো মেয়ে বলতে চাও? স্বামী আরেকটা বিয়ে করে বিদেশে থেকে গেল, ওকে নিল না, তার জন্যে এতটুকু লজ্জা, এতটুকু দুঃখ নেই ওর? ভালো-মানুষের মেয়েরা হয় ও-রকম? যখন-তখন আসে যায়, তুমিই তো বলেছ। এ-বাড়িতে থাকে কেন? ওকে চলে যেতে বল।

অলিমাসিমার বুক ঢিপঢিপ করে। এ আলোচনা ওর কানে গেলেই তো হয়েছে। হাসতে হাসতে তখুনি পাশের বাড়ি গিয়ে ঐ অলক বলে ছেলেটাকেই ফোন করবে হয়তো, সে-ই ঘর ঠিক করে দেবে, বাক্স নিয়ে চলে যাবে কেয়া। একতলায় অলিমাসিমা থাকবেন কি করে? নেপুকে বোঝাতে হয়,

দেখ নেপু, অত অধৈর্য হলে চলে কখনো? ঐ সিঁড়ির নিচে শুয়ে থাকে, ভারি সজাগ ঘুম ওর, ওকে না জানিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওঠে সাধ্য কার! আমিও নিশ্চিন্তে থাকি নেপু, ও একটা পাহারাওয়ালার মতো। তারপর এখন সংসারটাকে ও-ই ঠেকিয়ে রেখেছে; ও গেলে আমাকে নিচে যেতে হয়।

পাংশুমুখে নেপু অলিমাসিমার হাত চেপে ধরে—না না, একা আমি ওঁর কাছে থাকতে পারব না। আমার ভারি ভয় করে।

মাঝে মাঝে ক্যান্টিনের কথা মনে পড়ে। বটফলরা এসে এসে ফিরে যায়, কেয়া বলেছে। খাবার রেখে যায় রোজ, অলিমাসিমা রুগীর সেবা করছেন, পুষ্টিকর খাবার না হলে পারবেন কেন? কেয়া হেসে হেসে অলিমাসিকে সব খবর দেয়। সব কাজও করে দেয় কেয়া,

এত ভালো করে কাজ করে দেয় যে, অলিমাসিমা তারিফ না করে পারেন না। কিন্তু আর ওপরে যায় না।

সিঁড়ির মাঝখানের দরজাতে রাত ন'টার সময় রোজ নেপু নিজের হাতে তালা দিয়ে আসে। আটটার সময় অলিমাসিমা নিচে গিয়ে ট্রেতে সাজিয়ে নেপুর আর জামাইয়ের খাবার নিয়ে, ওদের খেতে বসিয়ে দেন। পরে ওদের বাসন হাতে করে, নিজেও নিচে গিয়ে যা হয় খেয়ে আসেন। নেপু আর নামতে দেয় না। কিন্তু রোজই অলিমাসিমার মনে হয় ঐ অলক ছোকরা এসে কেয়ার সঙ্গে হয়তো অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করে।

দিনে দিনে কেয়ার সাহস এমনি বাড়ে যে, একদিন রাত দশটার সময় নেপুর ফিক-ব্যথার জন্য গরম জলের ব্যাগ নিয়ে অলিমাসিমা নিচে নামেন, দেখেন খাবার ঘরের বড় শ্বেতপাথরের টেবিলে বসে কেয়া আর অলক চা আর সিঙাড়া খাচ্ছে আর হেসে হেসে গল্প করছে।

অলিমাসিমাকে দেখে এতটুকু লজ্জা নেই, উঠে দাঁড়িয়ে অলক অলিমাসিমার মুখের দিকে চেয়ে মৃদু-মৃদু হাসতে থাকে। অলিমাসিমার গা জ্বলে যায়।

বলিহারি সাহস, কেয়া। নেপু জানতে পারলে আর তোমাকে আস্ত রাখবে না। ওপরে মানুষটা অসুখ করে পড়ে রয়েছে, তোমাদের কি গালগল্পের সময়-অসময় নেই কেয়া ?

এমন করে বললে যেন অলককে দেখতেই পায়নি। তবু নরম গলায় অলক বললে,

অসুখ না হলে কি আর আমাকে ঢুকতে দিত, মাসিমা ?

অলিমাসিমার পিত্ত জ্বলে যায়।

তোমারি বা কি রকম আক্কেল, বাছা ? এত রাত্রে ভদ্রলোকের বাড়ি ঢুকে কেউ গল্প করে ?

কিন্তু কেয়া কিছুতেই রাগ করে না ; হেসে বলে,

এর আগে যে ওর ছুটি হয় না, মাসি। নিচের তলায় কথা বলবার লোক না পেয়ে আমিও তো হাঁপিয়ে উঠি। রেগো না লক্ষ্মীটি, ও এখুনি চলে যাবে। বরং এই সিঙাড়াটা খেয়ে ফেল।

ততক্ষণে জল ফুটে গেছে।

অলক উঠে বলে, চলি কেয়া, কাল একবার খবর নেব।

কেয়াও উঠে গিয়ে খিড়কি দরজা বন্ধ করে দেয়।

ব্যাগে জল ভরতে ভরতে অলিমাসিমা বলেন,

ওর সামনে মাংসের সিঙাড়ার কথাটা কি না-বললেই হত না কেয়া ?

কেয়া অবাক হয়ে যায়।

কে, মাসি, ও কিচ্ছু মনে করেনি, ওরা অন্য ধরনের মানুষ।

অলিমাসিমা চলে যেতে যেতে বলেন,

সে তো বুঝতেই পারছি, কেয়া, নইলে রাত দশটা অবধি একজন বিয়ে-হওয়া মেয়ের সঙ্গে গল্প করে !

কেয়া চুপ করে থাকে। অলিমাসিমা আশ্চর্য হয়ে ওর মুখের দিকে তাকান। খোলা দরজা দিয়ে অন্ধকার উঠোনের দিকে কেয়া চেয়ে আছে। মাথার ওপরকার ক্ষীণ আলোতে কেয়ার চোখের কোলে দীর্ঘ পল্লবের ছায়া পড়ে, বাইরের অন্ধকারের চেয়ে আরো গাঢ় অন্ধকার সৃষ্টি করে। যেন একটা বন্ধ দরজার সামনে এসে অলিমাসিমাকে থামতে হয়।

তখুনি ওপরে যেতে হয়, নেপু অধৈর্য হয়ে পড়বে।

রাত আরো গভীর হলে, জামাইকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে, নেপুর

কাপড়-ছাড়ার ঘরে অলিমাসিমা তাঁর পুরোনো খাটটির ওপরে পা উঠিয়ে বসেন। ঘুম আসে না এখানে। একতলার ঐ স্যাঁতসেঁতে শীতল নীরব ঘরখানি নইলে অলিমাসিমার ঘুম হয় না।

রেশমী মোজাটাকে নিয়েই হয়েছে মুশকিল। সেটাকে ওপরেও আনা যায় না, কেয়াকেও কিছু বলা যায় না। পেরেকের কৌটোর পেছনে, ঠিক সেই রকম আরেকটা কৌটোতে মোজাটা নিরাপদে লুকোনো আছে। বাইরের খুপরি জানলায় গ্রিল লাগানো, পাল্লা বন্ধ। এদিকের দরজায় গডরেজের তালা মারা। তবু মন খুঁতখুঁত করে। ইচ্ছে করে আর একবার গিয়ে দেখে আসি। বারে বারে ঘুম ভেঙে যায়। সঙ্গে সঙ্গে রাখতে পারলে ভালো হত; কিন্তু সত্তরটা এক শ টাকার নোট এতখানি জায়গা জুড়ে থাকে।

ও-ঘরে আলো জ্বালা থাকলে নেপুর ঘুম হয় না! আবার সব আলো নিভিয়ে দিলে নেপুর ভয়-ভয় করে। এ-ঘরের আলো তাই জ্বেলে রাখতে হয়। কেমন করে ঘুম হবে অলিমাসিমার?

কেয়া কি ঘুমোয়? নিচে একা-একা সিঁড়ির তলার ঘরে কেয়া কেমন করে ঘুমোয়? ছোট্ট কেয়াকে মনে পড়ে অলিমাসিমার। পাঁচ-ছ বছরের কেয়া, শামলা, পাতলা, ডাগর-ডাগর-চোখ একটা কেয়া, রাতে মা'র জন্য কাঁদত। নেপুর মা-বাবা তখন বেঁচে, নইলে কি আর এ-বাড়িতে ঠাই পেত? কোথায় গেল সেইসব দূর-সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনের দল, যারা বারোমাস এ-বাড়িতে থেকে লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে, এখানে-ওখানে চাকরি নিয়ে চলে গেল।

মনে হয় এইতো সেদিন রান্নাঘরের বারান্দায় সারি সারি পিঁড়ে পড়ত, কাঁসার-থালাতে ভাত খেয়ে, দুবেলা তারা আঁচাবার সময় থালা-গেলাস ধুয়ে, ঐ উঁচু জাগাটাতে উপুড় করে রেখে যেত। বাসন-মাজার ঝি অবিশ্যি দুবেলাই আসত, রাশি রাশি বাসন মেজে দিত।

কিন্তু ওরা সব নিজেদেরটা নিজেরা ধুয়ে দিয়ে যে-যার ইস্কুল-কলেজে চলে যেত।

মাস-কাবারে বুড়ো সরকার মশাইয়ের কাছ থেকে ইস্কুলের মাইনেটুকু চেয়ে নিত। পুজোর সময় সব দু-জোড়া করে কাপড়-জামা পেত। গাঁটরি করে মিলের কোরা কাপড় আসত এই ঘরে। অলি-মাসিমা কাঁচি দিয়ে জোড়া কেটে দিতেন। মোড়ার ওপর পা তুলে নেপুর মা বসতেন; বলতেন, চারখানি কাপড় চার রকম পাড়ের দিবি, অলি। নাম লিখে নেবে ওরা; ধোপায় দিলে গোলমাল হবে না।

কেয়ার জন্যও চার রঙের চারখানি ফ্রক আসত। রাত্রে কেয়া কাঁদে শুনে, নিজের ঘরে ওর বিছানা পাতালেন।

তাই নিয়ে নেপুর কি রাগ! ও-সব আদিখ্যেতা কোরো না বলছি, নাই দিলে কুকুরও মাথায় চড়ে।

তবে মা'র সামনে বলার সাহস ছিল না, যত রাগ ঝাড়ত অলি-মাসিমার ওপর। পাঁচ বছরের কেয়া তখন, ত্রিশ বছরের নেপু, বত্রিশ বছরের অলিমাসিমা। মনে হয় যেন কাল। কোরা কাপড়ের গন্ধ যেন নাকে আসে।

তারপর নেপুর মা-ও চোখ বুজলেন, অলিমাসিরও স্থান হল এক-তলার ঐ ছোট ঘরখানিতে, আর কেয়াও একতলায় বুড়ো সরকার মশায়ের স্ত্রীর কাছে শুতে গেল। কাকেও বলতে হয়নি, নিজের ছোট বালিশখানা বগলে করে সুড়সুড় করে কখন গিয়ে সরকার মশায়ের ঘরে আশ্রয় নিল, সরকার মশাই নিজেই টের পেলেন না। ভারি ভালো-বাসতেন ওকে।

কিন্তু অলিমাসিমার কাছে কেয়া কখনো আসেনি। এলে অলি-মাসিমা নিশ্চয়ই বিরক্ত হতেন। আর পাঁচটা ছেলেও তো এ-বাড়িতে মানুষ হয়ে গেছে, তবে মেয়ে শুধু ঐ কেয়া। পাড়ার স্কুল থেকে যেবার

সে ম্যাট্রিক পাস করল, নেপুর বাবা কোনো এক বন্ধুর ছেলের সঙ্গে খরচপত্র করে ওর বিয়ে দিয়ে দিলেন।

খরচের বহর দেখে নেপু তখনো রেগে টং, তবে বাপের ওপরও কথা বলার সাহস ছিল না। আর মা গিয়ে অবধি বাবা যেন আরো গম্ভীর হয়ে উঠেছিলেন ; কাছে এগুনোই দায়। তাছাড়া জামাই তখন পাটনায় প্র্যাকটিস করত, নেপুও অনেক সময় সেখানেই থাকত। বাবা গেলে পর ওরা এখানে এসে কায়েমী হয়ে বসল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অলিমাসিমা বড় চেনা ঘরখানিকে নতুন করে চেয়ে দেখেন। নেপুর মা যখন ছিলেন এ ঘরখানি আলো-জ্বালা মন্দিরের মতো ঝলমল করত। পদ্মবনের মতো সুগন্ধে ভুরভুর করত। আল-মারির দরজা অর্ধেক সময় খোলা থাকত। ভেতরকার থাক থাক নানান রঙের রেশমী শাড়ি দেখা যেত। তিনতলা আলনাটাতে সারি সারি গোড়ালি-তোলা জুতো থাকত। আয়নার সামনেটাকে দেখে মনে হত গয়নার দোকান। সারাদিন কাটত অলিমাসিমার এই ঘরে, ছুঁচ-সুতো নিয়ে, আর পাশের স্নানের ঘরে এনামেল করা ছোট গামলাতে লাক্ষ-গোলা জল নিয়ে। সাজসজ্জার সম্বন্ধে এমন কিছু নেই যা অলিমাসিমার অজানা। কিছুই কোনো কাজে লাগে না এখন।

মাঝে মাঝে সব কিছুতে অরুচি হত নেপুর মা'র, দিনের পর দিন বাড়ি থেকে বেরুত না। এই ঘরে স্টোভে করে এটা-ওটা রেঁধে অলিমাসিমা নেপুর মাকে ফুসলোতেন। নেপুর বাবা খুব বেশী বাইরে বাইরে থাকতেন। তাঁকে নিয়েই যে এইসব অভিমান, এটুকু অলি-মাসিমাও বুঝতেন। তার বেশী জানবার চেষ্টাও করতেন না।

নেপুর বাবা।

ঐ রকম মানুষ আর আজকাল তৈরী হয় না। সব তাঁর ছিল

বিশাল ; দোষ যদি থাকত সেও ছোট নয়। নেপুর বাবার শরীর মন বড় ছাঁচে ঢালাই করা ছিল।

কালে কালে অলিমাসিমার সঙ্গে তাঁর কেমন একটা অপ্রকাশিত ষড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল যেমন করে হোক নেপুর মাকে খুশি রাখতে হবে। নেপুর মাকে খুশি রাখা অলিমাসিমার একমাত্র চিন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কি সুন্দর ছিল এই মলিন ঘরখানি তখন! এ ঘরে পা দিলে মন আপনা থেকে ভালো হয়ে যেত। এ ঘরে সুন্দরের পুজো হত তখন, যেদিকে অলিমাসিমার চোখ পড়ত, মুগ্ধ হয়ে যেতেন।

সারাদিন একভাবে কেটে যেত।

রাত্রে যেই আলো নিভিয়ে ছোট খাটটিতে এসে শুতেন, অমনি চোখের সামনে ভেসে উঠত বর্ধমানের একপাশে, বড় একটা বাড়ির লাগোয়া ছোট একফালি জমি। সেখানে অলিমাসিমা আসবার আগে হিমসাগর আমের একটি কলম পুঁতে দিয়েছিলেন। এখানে এই রূপের হাটে অলিমাসিমার নিজের বলতে এক তিল স্থান নেই বটে, কিন্তু সেই জায়গাটা তাঁর একান্ত আপনার। সেই সময় থেকে অলিমাসিমা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, ঐখানে ছোট একখানি বাড়ি তুলবেন, যা হবে একান্ত তাঁর নিজস্ব, যেখানে তিনিই হবেন সম্রাজ্ঞী।

তখনো চোখের সামনে বাড়িখানি নির্দিষ্ট একটা রূপ ধরেনি, নীল কাগজে তার নক্সা হয়নি, ছোট ছাপা বই থেকে কেউ তার বাইরের চেহারা অলিমাসিমাকে দেখায়নি, তবু সে তাঁর সমস্ত হৃদয়খানি তখন থেকেই জুড়ে ছিল।

চল্লিশ বছরে সাত হাজার টাকা জমল। মুক্তোর দাম তিনি হাজার টাকা, মা'র কথা অবিশ্বাস করবার কথা অলিমাসিমার কখনো মনেও হয় না। আরো দু হাজার জমাতে হবে। বারো হাজার টাকা হলে, সেখানে সস্তায় একটি ঘর ভাড়া করে তিনমাস থাকতে হবে। বটফলের

দাদা বলেছেন বাড়ি করতে তিনমাস লাগবে। তার জন্য অলিমাসিমা দশ বছর অপেক্ষা করতে পারবেন না।

মন ঠিক করে ফেলেন। কালই একবার বটফলের ওখানে গিয়ে কথা দিয়ে আসবেন। দু বছরে অলিমাসিমা দু হাজার টাকা তুলবেন। আর মাত্র দুটি বছর। শুধু দুটি বছর।

আলোর দিকে পিঠ ফিরে চোখ বোঁজেন অলিমাসিমা। অমনি কানে বেজে ওঠে ঝাঁপতাল, এত জোরে বাজে যে, অলিমাসিমার ভয় হয় বুঝি জামাইয়ের ঘুম ভেঙে যাবে।

নেপু এসে আস্তে আস্তে হাত ধরে নাড়া দেয়।

দেখবে চল, অলিমাসি, মনে হচ্ছে নিশ্বাস পড়ছে না।

বুকটা ধড়াস করে ওঠে। নিশ্বাস পড়ছে না আবার কি? কাছে গিয়ে কান পেতে শোনেন, কই না তো, নিশ্বাস তো পড়ছে, ওসব নেপুর মনের ভয়। নেপু হাতটা চেপে ধরে,

তুমি ও-ঘরে যেও না, অলিমাসি, পায়ের কাছের সোফাটায় শুয়ে থাক, আমার ভারি ভয় করে।

ঝাঁপতাল আর বাজে না। আস্তে আস্তে অলিমাসিমা ঘুমিয়ে পড়েন।

পরদিন সকালে নেপু বলে, তুমি আর নিচে থেকো না, অলিমাসি, ঐ ঘরটাতে এখন থেকে শোও। গয়লাকে ডাকো তোমার জিনিসপত্র এইখানে এনে দিক। তুমি কাছে আছ, বারান্দায় কুকুরগুলো ছাড়া থাকে, নইলে কি আমার চোখে ঘুম আসত?

কিসের ভয় নেপুর? চোরে এসে যদি অর্ধেক নিয়েই যায়, টেরও পাবে না নেপু। পরে এই সমস্ত পাবে নেপুর ছোট কাকার ছেলে আনন্দ। নেপুর বাবা উইল করে দিয়েছিলেন। সমস্ত নেপুর, তার-পরও জামাই বেঁচে থাকলে তার; কিন্তু তারপর আনন্দর। জামাই যা

আয় করেছে, তার ওপর অবিশ্যি বাবার হাত ছিল না। কিন্তু সে তো আর আলাদা করে রাখাও নেই, লেখাও নেই।

কতবার নেপু জামাইকে সে বিষয় বলেছে। অলিমাসিমার নিজের কানে শোনা। এইতো কালই জামাইও হেসে বলেছে, কি হবে আলাদা করে, নেপু? সঙ্গে করে নিয়ে যাবে নাকি? সেখানে তো শুনেছি পথ ঘাট সোনা দিয়ে বাঁধানো, কি হবে নিয়ে গিয়ে?

শুনে নেপু রাগ করেছে। শেষে জামাই বলেছে, সত্যি বলব, নেপু? আমার আলাদা একটা অ্যাকাউণ্ট আছে জানো? আমার মা'র নামে এখানকার হাসপাতালে কয়েকটা বেড করে দিয়ে যাব মনে করেছি। সেই রকম লেখাপড়াও করে রেখেছি।

নেপু স্তম্ভিত হয়—কই, এতদিন তো কিছু বলনি।

কি বলব, বল। মা'র জন্যে তো কিছুই করতে পারিনি। বাবা অল্পবয়সে গেলেন, কি জানি কেন তোমার বাবার চোখে লেগে গেলাম, ভালো ছাত্র ছিলাম, উনিই তোমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে, বিলেত পাঠিয়ে ব্যারিস্টার করে আনলেন। কিন্তু মা তো অনেকদিন ছিলেন দেশের বাড়িতে, নিজেরটা তাঁর চলে যেত। কিছু করতে হয়নি তাঁর জন্য। সেই কথা মাঝে মাঝে মনে হয়।

নেপু হাঁড়িমুখ করে বলে, অসুখ করে তুমি কি রকম অন্যরকম হয়ে গেছ।

জামাই একটু হাসে। জীবনটা ভারি অদ্ভুত, না নেপু?

নেপু বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে, বাইরে কার পায়ের শব্দ না?

কে? কে ওখানে?

দরজার পর্দা সরিয়ে আনন্দ এসে ঢোকে। জামাইবাবুর এমন একটা ফাঁড়া গেল, একটা খবরও তো দিতে হয়, নেপুদি।

নেপু কর্কশ গলায় বলে,

কেন ? এসে কি করতে শুনি ? আমি যদ্দিন বেঁচে আছি, তোমার কোনো সুবিধে হবে না, আনন্দ, এই বলে রাখলাম।

জামাই ব্যস্ত হয়, আনন্দ কিন্তু হেসে বলে,

সে কি আর জানি না, নেপুদি ? জন্মে অবধি তো শুনে আসছি। কিছুতেই কি তোমার স্বাস্থ্যে টোল খায় না ? খাওয়াটা একটু কমাও না কেন ?

জামাইও হেসে ফেলে।

নেপুর মুখ রাঙা হয়ে ওঠে—তবু শুনিই না কেন এসেছ ?

কি মুশকিল ! মানুষ কি মানুষকে অসুখের সময় দেখতে আসে না ? তুমি যে মানুষই নও, নেপুদি, তাই এসব বোঝ না।

ভারি সুন্দর চেহারা আনন্দর, বছর ত্রিশ বয়স হবে, বিলিতী আপিসে চাকরি করে, বিয়ে-থা করেনি, ভাবনা-চিন্তা নেই।

জামাই ডেকে বলে, আয় আনন্দ, কাছে আয়, দুটো কথা বলি তোর সঙ্গে। অলিমাসি, ওকে একটু চা জলখাবার করে দাও না।

অলিমাসি নিচে যান, নেপুও সঙ্গে নামে। ওর সঙ্গে এক ঘরে আমি বসতে পারিনে, অলিমাসি। কেন আসে, জানি। এই সমস্ত যে একদিন ও পাবে, তাই আমাকে মনে করিয়ে দিতে আসে। আমার ইচ্ছে হয়, সব পুড়িয়ে দিই, কিচ্ছু না পাক। কিন্তু তবু জমিটা পাবে, ব্যাঙ্কের টাকাগুলো পাবে। এক যদি না সেগুলো খরচ করে দিই। তাও কি সব ধরে বেঁধে দেওয়া আছে শুনেছি।

অলিমাসি বললেন, আমরা যখন থাকব না, তখন পাক না যার খুশি, আমাদের তাতে কি বা এসে যাবে।

শোনে না নেপু। মরার কথা শুনতে তার ভারি আপত্তি। বলে,

কি বলে বেড়ায়, জানো, অলিমাসি ? সেদিন মিসেস সিনহার ওখানে ও-ও ছিল, বলে কি না, খাবার টেবিলে বসে সবাইকে শুনিয়ে

বলে কি না, দাঁড়াও না, একবার হাতে পেলেই হয়, সব বেচে দেব, বালিগঞ্জে নতুন বাড়ি করব, তোমাদের সব গৃহ-প্রবেশে নেমন্তন্ন রইল।

কাঁদে নেপু। বলে, আমাদের অবর্তমানে সব উড়িয়ে দেবে, তাই নিয়ে গর্ব করে বেড়ায়। চায় যে আমরা শিগ্‌গির মরি, তাই দেখতে এসেছে, কই অন্য সময় তো আসে না।

যা-তা বলে যায় নেপু। কেয়া নিমকি বেলতে-বেলতে অবাক হয়ে শোনে। অবাক হয়ে বলে,

সে কি নেপুদি, আনন্দ ভারি ভালো ছেলে, ভালো মনে করেই দেখতে এসেছে—

নেপু জ্বলে ওঠে—তুমি বড়দের কথার মধ্যে কথা বল কেন, কেয়া ? আনন্দ আবার কি, আনন্দবাবু বলবে।

অলিমাসিরও হাসি পায়। আনন্দ আর কেয়া ছোটবেলায় এক ক্লাসে পড়ত পাড়ার প্রাইমারী স্কুলে, সারাক্ষণ মারপিট করত। আনন্দও বহুদিন এই বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করেছে। রান্নাঘরের সামনে কেয়ার সঙ্গে ভাত খেয়েছে।

কেয়া একমনে নিমকি বেলে যায়, ঠোঁটের কোণে একটু হাসি লেগেই থাকে, সব সময় থাকে। নেপু আবার বলে,

তুমি এই বিকেলবেলায় বড় যে বাড়িতে বসে ? আপিস নেই ?

কেয়া বলে, জামাইবাবুর অসুখের জন্য দশ দিন ছুটি নিয়েছিলাম, যদি কিছু দরকার হয়।

দরকার ? তোমাকে দিয়ে আবার কি দরকার হতে পারে ? না, না, আপিস কামাই করাটা ঠিক নয়, তুমি কাল থেকেই যেও।

কিন্তু, নেপুদি, রাঁধাবাড়াটা তাহলে—

নেপুর গলাটা একটু চড়ে যায়—আমাদের রাঁধাবাড়ার জন্য

তোমাকে অত ভাবতে হবে না, কেয়া, কবেই বা আমাদের সুখ-সুবিধের কথা ভেবেছ?

অলিমাসিমার দিকে ফিরে বলে,

হিটারের প্লাগ খুলে ওপরে নিয়ে যেও। আগেও তো কাপড়-ছাড়ার ঘরে মা'র জন্য রেঁধেছ দেখেছি; আবার তাই হবে। অন্ততঃ উনি উঠে না দাঁড়ানো অবধি।

কেয়ার কিছুতেই কিছু হয় না। হেসে বলে, নিচের তলায় সারাদিন কেউ না থাকলে কি চলে, নেপুদি? গয়লা দিনরাত যাওয়া-আসা করে, ফকরুল আসে মাংস আর ডিম নিয়ে, ধোপা আসে, শঙ্কর আসে। একশ বার খিড়কি খুলতে হয়, আবার বন্ধ করতে হয়। একজন কাকেও থাকতেই হয়।

নেপু বিরক্ত হয়ে বলে,

যেই থাকুক, নিজের কাজের ক্ষতি করে তোমাকে থাকতে হবে না। সারাদিন, অলিমাসি, তুমি বরং নিচেই থেকো, রাত্রে কিন্তু ওপরে শোবে, তখন কেয়া থাকবে নিচে। তখন তো আর কেউ আসবে না।

অলিমাসিমা চোখ তুলে কেয়ার দিকে তাকান, কেয়াও তাঁর চোখের দিকে চেয়ে থাকে, ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসি লেগেই থাকে।

দেখে অলিমাসিমার গা জ্বলে যায়।

ওদিকে নেপু তাড়া দেয়।

হাত চালাও, অলিমাসি, ঐ আনন্দকে ওরকম ভাবে ওপরে ছেড়ে রাখাটা ঠিক নয়। বরং আমি যাই, তুমি একেবারে ও-ক'টা ভেজে নিয়ে এসো। ঐ ঘিতেই কিন্তু ওবেলার রান্নাটাও চালাবে, অলিমাসি। উনি তো জলখাবার ফরমাশ করেই খালাস, তেল ঘি যে বিনা পয়সায় আসে না, সে খেয়াল নেই।

নেপু চলে গেলে, চাকি বেলুন তুলে রেখে কেয়া বললে,

কিসের ওর এত ভয়, মাসি ?

অলিমাসিমা এবার জ্বলে উঠেন,

তোমার কি সত্যি কোনো লজ্জাশরম নেই কেয়া ? নিজের অবস্থাটা বোঝ না ? বারে বারে ওর মুখের ওপর চোপা করতে একটুও বাধে না ? আমি বুড়ো মানুষ, চুপ করে থাকি, আর তোমার অত মুখ খোলবার কি দরকারটা শুনি ?

কেয়া শূন্যের দিকে চেয়ে, চুল থেকে মোটা রুপোর কাঁটাটা টেনে বের করে। অমনি একরাশি কালো চুল জলপ্রপাতের মতো পিঠময় ছড়িয়ে পড়ে, কানের কাছে দুলতে থাকে, কোমল কপোলের ওপর নেমে আসে। মনে পড়ে নেপুর মা'র মাথার কালো কোঁকড়া চুলগুলি। ইচ্ছে করে বাইশটা সরু কালো কাঁটা দিয়ে কেয়ার চুলগুলো মাথার ওপর চূড়ো করে, কুইন-অ্যান খোঁপা বেঁধে দিতে। কি যা-তা কথা সব মনে হয় আজকাল। কেয়ার চুল বাঁধতে যাবেন কেন অলি-মাসিমা। এত বছর এক বাড়িতে বাস করেও কেয়ার জন্য কখনো কিছু করেছেন বলে মনে পড়ে না অলিমাসিমার। কেয়ার জন্য ? কেয়ার জন্য আবার কে কবে কি করেছিল ? নেপুর মা-বাবা ছাড়া। তাঁরা তো অমন বহুজনার জন্য বহু করেছিলেন, টেরও পাননি। অঢেল দিয়েছিল ভগবান।

খোলা চুল নিয়েই আশেপাশে ঘুরঘুর করে কেয়া, কি যেন বলি বলি করেও বলে না। ট্রের ওপর নিমকি, পেয়ালা পিরিচ, চায়ের সরঞ্জাম সাজিয়ে নিয়ে অলিমাসিমা উঠে দাঁড়ান।

সিঁড়ির ওপর পর্যন্ত পৌঁছে দেব, মাসি ?

অলিমাসিমা জিগেস করেন, কেন ? আনন্দ এসেছে বলে ?

কেয়া হাসে।

আরে, না না, তোমার পায়ে কিনা গুপো, তাই। আর আনন্দ

কি এখন এসেছে ভেবেছ নাকি? আমার সঙ্গে আধঘণ্টা বাজে বকে, তবে ওপরে গেল। কি না বললে নেপুদির বিষয়! হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেল। আহা, দাও না ট্রেটা, পৌঁছে দিই। নইলে কোন্‌দিন দেবে ফেলে! নিজেরও ঠ্যাং ভাঙবে, ওগুলোও যাবে।

এ কথাটা মন্দ বলেনি কেয়া। আজকাল হাত কাঁপে, পা কাঁপে। কিন্তু কেয়ার অন্য কথাগুলি অসহ্য।

তাই দাও, কেয়া। নিজের হাত-পা'র ওপর দিন দিন দখল হারাচ্ছি। অথচ কি-ই বা বয়স হল।

কেয়া সান্ত্বনা দিয়ে বলে,

কিছু না, কিছু না, ষাট বছর আবার একটা বয়স নাকি?

কেয়ার যেমন কথা। ষাট বছর কোথায় পেল, এইতো সবে সাতান্ন। ষাট বছর হবে যখন, তখন আর এখানে অলিমাসিমাকে দেখা যাবে না।

মনটা হঠাৎ ভালো হয়ে যায়।

সিঁড়ির মাথা থেকে কেয়াকে বিদায় দিয়ে, ট্রে নিয়ে ঘরে ঢোকেন অলিমাসিমা।

অনেকক্ষণ ছিল আনন্দ, জামাই কিছুতেই তাকে ছাড়তে চায় না। যাবার সময় বার বার বলে, আবার এসো আনন্দ, ঘোষকে নিশ্চয় নিয়ে এসো, একা একা পড়ে থাকি, কথা বলবার লোক নেই।

পরে নেপু অনুযোগ দেয়,

কথা বলবার লোক নেই মানে? আমরা কি মানুষ না?

আনন্দর কথাগুলি মনে পড়ে।

কি অভদ্র বেয়াড়া ছেলে, বাবা! গুরুজন বলে একটু সমীহ করে না! যা মুখে আসে বলে! হলই বা নিজের কাকার ছেলে, তাই বলে বাড়ি বয়ে অপমান করে যাবে, আর তুমি তাকে উল্টে চা জলখাবার দেবে!

জামাই হেসে বলে, মাঝে একবার মনে হয়েছিল তুমি বুঝি রেগে-মেগে ওর চা-জলখাবারটা ছিনিয়ে নেবে! বুঝলে, অলিমাসি, আনন্দ তো কেয়ার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কেয়ার বড়সাহেবের সঙ্গে নাকি কোথায় দেখা হয়েছে, সেও নাকি কেয়ার ভারি সুখ্যাতি করেছে। ওর স্বামীর কথা শুনে সে অবাক, কেয়ার যে বিয়ে হয়েছে, তাই জানত না!

নেপু বলে, জানবে কি করে? এ তো আর আমার কি অলিমাসিমার মতো ঘরের বৌ নয়, ওর কোন্ ব্যবহারটা বিবাহিত মেয়ের মতো তাই বল। ত্রিশ বছর বয়স হল, ঘুরে বেড়ায় যেন কলেজের মেয়েটি!

জামাই বলে,

মনটাকে আরেকটু উদার কর, নেপু, ঘরের বৌদের কোনো প্রাপ্যই ভগবান ওকে দেয়নি, ঘরের বৌয়ের মতো হবে কি করে?

জামাইয়ের পেছন থেকে অলিমাসিমা ঠোঁটে তর্জনী রেখে নেপুকে তর্ক থেকে নিবৃত্ত করেন। উত্তেজিত হলে জামাইয়ের সেরে উঠতে দেরি লাগবে, ডাক্তার বলে গেছে।

কি জানি, অসুখটা হয়ে অবধি মনে হয় জামাইয়ের বাইরে থেকে একটি বড় চেনা খোলস খসে পড়ছে, সম্পূর্ণ অচেনা একটি নতুন মানুষ ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে। অলিমাসিমা আশ্চর্য হয়ে ভাবেন, একটা মানুষের সঙ্গে সারা জীবন বাস করেও তাকে চেনা যায় না।

বহু বছর ধরে মনে পড়ে জামাইকে। কবে যে প্রথম দেখে-ছিলেন মনে করা মুশকিল হয়ে পড়ে। তবে নেপুর কথা স্পষ্ট মনে আছে। সেই প্রথম যেদিন এসেছিলেন নেপুর মা'র সঙ্গে দোতলার এই বড় শোবার ঘরটিতে, সেদিন থেকে মনে পড়ে।

নেপুর মা অলিমাসিমার হাতে একটা নরম ছোট্ট রুপো দিয়ে বাঁধানো বুরুশ দিয়ে বলেছিলেন, দেখি, তোমার হাতখানি কেমন দেখি। এই বুরুশটা দিয়ে, একটিও চুল না ছিঁড়ে, আমার চুলের জট ছাড়িয়ে দাও তো দেখি।

অলিমাসিমা তার আগে চুলের বুরুশ চোখে দেখেন নি। ভয়ে ভয়ে বুরুশ নিয়ে, আস্তে আস্তে নেপুর মা'র মাথার ওপর তিনতলা উঁচু মাদাম-পম্পাডুর খোঁপা থেকে আটত্রিশটা কাঁটা আর বাঁকা বাঁকা লম্বা দাঁতওয়ালা তিনটে শক্ত চিরুনি খুলেছিলেন। চুলগুলি তখুনি হুড়মুড় করে নেমে পড়েছিল। কালো ভোমরার মতো চুল, কোঁকড়া, যেন আঙুরের গোছা, জটে ভরা। সত্যিই বুরুশের কর্ম নয়। বুরুশ নামিয়ে রেখে, অলিমাসিমা আস্তে আস্তে আঙুল দিয়ে চুল চিরে-চিরে জট ছাড়িয়ে দিতে লাগলেন। নেপুর মা'র চোখ বুঁজে এল। এক-বার অলিমাসিমার হাত দুখানি ধরে টেনে সামনে এনে বলেছিলেন, মিষ্টিহাত, সেবার হাত, বেঁচে থাকো, অলি।

শুনে অলিমাসিমার প্রাণটা যেন জুড়িয়ে গেছিল।

কোনো সময় মনে হয়েছিল কে যেন তাঁকে দেখছে। চোখ তুলে দেখেন, দরজার পর্দা হাত দিয়ে সরিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে একটি রোগা, অদ্ভুত ফরসা, কটা চোখের বারো-তেরো বছরের মেয়ে। দেখে হঠাৎ বাঙালী বলে চেনা যায় না। লম্বা লম্বা সাদা-লাল ডোরা-কাটা রেশমী ফ্রক পরনে, তার কোমরে চওড়া লাল ফিতে বাঁধা, পায়ে কালো জুতো-মোজা, খোলা লালচে রুক্ষ চুলের একপাশে লাল একটা রিবন ফুল করে বাঁধা। মুখটা একটু হাঁ করে অবাক হয়ে মেয়েটি চেয়ে আছে, সামনের দাঁতগুলি উঁচু, অসমান। তার ওপর দিয়ে একটা সোনার বেড়ি আঁটো করে পরানো। দাঁত সোজা করবার জন্য সাহেব-ডাক্তার নিজের হাতে পরিয়ে দিয়েছে, নেপু পরে গর্ব করে অলিমাসিমাকে বলেছিল।

নেপুর মা চোখ না খুলেই বললেন, কে? নৃপবালা? এসো, তোমার অলিমাসিমার সঙ্গে আলাপ কর।

নেপু আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকল। মাথায় অলিমাসিমার চাইতে খানিকটা উঁচু, বয়সে প্রায় সমান সমান। লোরেটোতে পড়ে; পিয়ানো বাজাতে শেখে, সন্ধ্যেবেলা হলঘরে মেমের পাশে বসে। তবে ঠাকুমা সেকেলে নাম রেখে দিয়েছিলেন নৃপবালা, এই যা দুঃখ।

মিসেস সমারভিলকেও অলিমাসিমার মনে পড়ে। এর আগে কখনো মেম দেখেননি। এখন মনে হয় হয়তো বছর পঞ্চাশেক বয়স ছিল, মোটাসোটা গড়নটি, কালো সিল্কের পোশাক, ওপরদিকটা আঁটো, পায়ের দিকে গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা, ফুলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। বুকে একটা মস্ত সোনা বাঁধানো গোলাপী পাথরের ব্রুচ লাগানো থাকত, তার ওপর একজন উব্দো খোঁপা বাঁধা মেমের মুখ উঁচু উঁচু করে আঁকা। নাকি মেমের মায়ের মুখ। মেমেদের আবার মা থাকে, অলিমাসিমা এই প্রথম শুনলেন। ব্রুচ ছাড়া একটি ঘড়িও বুকের ওপর ঝুলত, ছোট্ট সোনার একটা বো-বাঁধা পিন দিয়ে আটকানো। মেমের নাকের ওপর একটা চেন-বাঁধা চিমটি-কাটা চশমা বসানো থাকত। সেটা মাঝে মাঝে খুলে খুলে পড়ে যেত। আবার লাগিয়ে নিতে হত। মুগ্ধ বিস্ময়ে অলিমাসিমা মিসেস সমারভিলকে দেখতেন। নেপুর মা'র হুকুম ছিল, যতক্ষণ নেপু পিয়ানো শিখবে, অলিমাসিমা ওখান থেকে নড়বেন না। পরে নেপুর মাকে এসে জানাবেন কেমন পিয়ানো শেখা হল, কে কে ঘরে ঢুকল, নেপুর বাবা পিয়ানো শুনতে গেলেন কিনা, এই সব।

মস্ত পিয়ানো কেনা হয়েছিল, রাশি রাশি টাকা খরচ হয়েছিল। সেই পুরোনো পিয়ানো নেপু পরে সাড়ে তিন হাজার টাকা দিয়ে বেচে দিয়েছিল। কিন্তু দু বছরের বেশী বাজানো হয় নি। নেপুর পনরো

পুরে গেলেই বিয়ে হয়ে গেল। জামাই বিলেত গেলে পর, নেপুর বাবা অনেক করে বলা সত্ত্বেও, নেপু আর পিয়ানো ছুঁল না। মেম আসাও বন্ধ হল, নেপুর মা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

মনে পড়ে জামাই বিলেত থেকে ফিরে মাসখানেক এ বাড়িতে ছিল। ভারি ভালো চেহারাখানি ছিল তখন, কিন্তু কথা খুব কম বলত। তবে কেউ প্রশ্ন করলে সুন্দর করে উত্তর দিত। অলিমাসিমা শুনেছিলেন জামাই ভারি পণ্ডিত মানুষ, বইটই নিয়ে থাকতে দেখেওছিলেন, কিন্তু কথাবার্তা বলেননি কখনো।

যখন জামাই পাটনায় প্র্যাকটিস করতে গেল, তখন দেখাশুনোও একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। নেপুর বাবা মা স্বর্গে গেলে পর জামাইয়ের সঙ্গে অলিমাসিমার সত্যিকারের পরিচয় হয়েছিল, এক বাড়িতে বহু বছর থাকার মধ্যে দিয়ে।

কিন্তু সেই কি সত্যিকারের পরিচয়? সেই নেপুর কথার পেছনে আড়াল-হয়ে-যাওয়া পরিচয়টাই কি জামাইয়ের যথার্থ পরিচয়? তবে এখন তাকে অন্যরকম মনে হয় কেন?

রাতে আর ওপরে মন বসে না, খাবার ঘরের পাশের ঐ খালি ঘরখানির জন্য প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে। যথেষ্ট নিরাপদ তো ঘরটা? সকালে অলিমাসিমা স্নান করে এসে, জানলার গ্রিল ধরে টেনে দেখেন। মোটা লোহার গ্রিল, সেকালের জেলখানায় এরকম থাকত, দেয়ালের ইঁট ফুঁড়ে শক্ত করে বসানো, এতকাল পরেও একটুও নড়ে না।

জানলা দেখতে গিয়ে, জানলার নিচেকার তক্তাটার ওপর চোখ পড়ে। পুরোনো কাঠের পুরু তক্তা, আগে এর ওপর মেডেন-হেয়ার ফার্নের চ্যাপ্টা টব বসানো থাকত। কালো বোঁটার ওপর ছড়া ছড়া হাল্কা সবুজ পাতার সে কি বাহার! ভারি যত্ন করতে হত ওঁদের।

নেপু মালী ছাড়িয়ে দেবার পর গাছগুলি সব মরে গেল, টবগুলি কোন্‌দিন ভেঙে পড়ে গেল, শুধু তক্তাটা রইল।

শ্যাওলা-ধরা ফাটা একটা কালো তক্তা, তার ফাটলে ফাটলে, খাঁজে খাঁজে সে কি রঙের রূপের মেলা! অলিমাসিমা যতবার দেখেন অবাক হয়ে ভাবেন ব্যাঙের ছাতা আবার এত সুন্দর হয়।

আগে কিন্তু ওদের রূপটা অত চোখে পড়ত না। কি একটা সোঁদা সোঁদা গন্ধ লাগত, সাপ-খোপের গায়ের গন্ধের কথা মনে হত। দু-একবার কেটলি করে ফুটন্ত জল এনে ঢাললেন ব্যাঙের ছাতার ওপর। অমনি তারা কালো হয়ে, কুঁকড়ে, মরে গেল। কিন্তু তারপরেই আবার দু-এক পশলা বৃষ্টি পড়লে, ছোট ছোট শত শত ব্যাঙের ছাতায় তক্তাখানি ঢেকে গেল। মোমের মতো কচি মোলায়েম বোঁটাগুলি, মনে হয় ছুঁলেই ভেঙে যাবে। তার মাথায় কতো রকম ফিকে রঙের ফুলের মতো, টোপরের মতো, পাতার মতো ছাতা ধরা। দেখে দেখে মন ভরে না অলিমাসিমার। ভাবেন এত রূপে দেখবার চোখ কোথায় পাই?

বাইরে থেকে গয়লা ডাকে, মাছ নিয়ে এসে মংরুর বৌ ডাকে, মাংস ডিম নিয়ে ফকরুল ডাকে, নকুড়বাবুর বাড়ি থেকে ছোট ঝোড়ায় করে শরবতি লেবু, আপেল, ডালিম আসে। এ বাড়ি থেকে কেউ বাজারে যায় না, সব জিনিস আপনা থেকেই দোরগোড়ায় এসে পেঁছয়। ভারি একটা গর্ব বোধ করেন অলিমাসিমা।

আজকাল আর উঠোনের ওপারে রান্নাঘরে যান না অলিমাসিমা, নেপু ডাকলে সেখান থেকে শোনা যাবে না। গয়লা তোলা উনুনটা ধরিয়ে এনে দেয়, অলিমাসিমা খাবার ঘরের কোণাতে, মোড়ায় বসে, রান্নাটা সেরে নেন। কিছু কিছু হিটারেও বসান।

আপিস যাবার আগে পর্যন্ত কেয়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করে। রোজ অলিমাসিমা ওকে সাবধান করে দেন,

ও কেয়া, সাড়ে আটটার মধ্যে নিশ্চয় নিশ্চয় ফিরো কিন্তু। জানো তো, নটার মধ্যে দরজায় তালা দিতে চাইবে।

কেয়া কেমন একটা তাচ্ছিল্যের সুরে বলে, লুকিয়ে রাখো না কেন, এক এক দিন, তালাটাকে ?

এরকম কথা অলিমাসিমা সইতে পারেন না। যে নিয়মের কাঠামোতে অলিমাসিমার মনটা গড়ে উঠেছে, সেখানে এ ধরনের কথা একেবারে অচল। কিন্তু কেয়াকে চটাতে ভয় করে। অবিশ্যি চটে না কখনো কেয়া, ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত চটতে দেখেনি কেউ কেয়াকে। চটে না, মিছে কথা বলে না, নিজেকে সমর্থন করবার চেষ্টা করে না, কিন্তু সম্মানও করে না কাকেও। যা ইচ্ছে হয় করে। চটবে না, তবে না চটেই বাক্স নিয়ে চলে যাবে এটা ঠিক। একতলাটা তা হলে খালি পড়ে থাকবে। নেপু হয়তো বলবে, ভেতর থেকে বন্ধ করে দাও, সিঁড়ির দরজাতে তালা দিয়ে দিই, থাক একতলাটা। তখন কি হবে ?

ভাবলেও অলিমাসিমার গা শিউরে ওঠে। যাবেন নাকি একদিন ঘণ্টা দুইএর জন্য বাইরে ? বৃহস্পতিবার বটফলের ডিউটি থাকে না, ওকে সঙ্গে করে পোস্টাপিসে গিয়ে, টাকাগুলো একেবারে জমা দিয়ে দিলেই সব ল্যাঠা চুকে যাবে। এভাবে আর কদিন চলবে !

কিন্তু পোস্টাপিসে যাওয়া মানেই পোস্টমাস্টার জানবেন ; যা স্ত্রৈণ ভদ্রলোক, ওঁর বৌ-ও জানবে ; সে তো পাড়ার সমিতির একটি পাণ্ডা, অমন গপ্পে মেয়েমানুষ ভূ-ভারতে আর দুটি নেই, তাকে জানানো মানেই ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে দেওয়া। তারপর বটফলের দাদা বলেছিলেন পোস্টাপিসে টাকা জমা দেওয়া সহজ, কিন্তু তোলা প্রায় অসম্ভব। নাকি পাঁচশ রকমের ফ্যাঁকড়া বেরোয়, সই মেলে না, নোটিশ চায়। তা করলে তো হবে না। হাতে হাতে খরচ মিটিয়ে দিতে না পারলে, তিনমাসে কখনও বাড়ি হয় না।

অলিমাসিমা ভেবে কূল পান না। রোজই কেয়া আটটা বাজার আগেই এসে উপস্থিত হয়। হেসে বলে,

রোজ রোজ আগে আসা ধরেছি, মাসি, তোমাদের অভ্যাস খারাপ করে দিচ্ছি। ওদিকে আমার অনুপস্থিতিতে আমাদের ক্লাব উঠে যাবার যোগাড়! দুটো তিনটে আপিস মিলে মস্তবড় ইউনিয়ন হচ্ছে আমাদের, সরকারী সাহায্য পাওয়া যাবে, তা জানো? আমরা সাড়ে তিন হাজার তুলে দিতে পারলে, সরকারের কাছ থেকে সাড়ে তিন হাজার পাওয়া যাবে।

অলিমাসিমা অবাক হন।

সে কি! তোমরা মাসকাবারে মাইনে পাও; চাঁদা করে ক্লাব করেছ, ইউনিয়ন করেছ; নিজেই বলছ ইউনিয়ন হলে মাইনে বাড়ানর সুবিধে হবে; তার ওপর আবার সরকার কেন টাকা দেবে?

কেয়া হাসে।

জানো, মাসি, আমি হলাম গিয়ে ট্রেজারার আর অলক সেক্রেটারি। খুব ভালো হল না?

কিন্তু অলিমাসিমার ভালো লাগে না।

তুমি একজনের বিবাহিতা স্ত্রী, ঐ একটা বাইরের বাজে ছেলে, ওর সঙ্গে এতটা মাখামাখি কি খুব ভালো?

কেয়া বলে,

বাজে ছেলে হবে কেন, মাসি? খুব ভালো পরিবার ওদের, ও এম-এ পাস জানো? টাইপের আপিসে তিন শ টাকা মাইনে পায়, বাড়িতে বুড়ী মাকে রেখেছে, মোটেই বাজে ছেলে নয়, মাসি।

অলিমাসিমা ছাড়েন না,

তা না-হয় না হল। কিন্তু তুমি তো একজনের বিবাহিতা স্ত্রী, তোমার সঙ্গে অত মেলামেশা আবার কেন!

কেয়া বলে,

কাকে বেশী মেলামেশা বল তুমি, মাসি? কোথাও যাও না কিনা, বাইরের লোক দেখলেই ভয় পাও। আর বিবাহিতা স্ত্রী? কার বিবাহিতা স্ত্রী? বরং হ্যাঁ, এটা বলতে পারো যে আমার একটা বিবাহিত স্বামী আছে। মেম বিয়ে করে বিলেতে থাকে। কে জানে হয়তো কলেজে পড়া দু-তিনটে ছেলেমেয়েও আছে এতদিনে, দো-রঙা দু-তিনটে ছেলেমেয়ে!

কেয়া খুব হাসে। ওকে বুঝে ওঠা দায়। অলিমাসিমা কথা পালটিয়ে বলেন,

যাই হোক সকাল সকাল যে আসো, আমি তাতেই খুশি। তুমি না আসা পর্যন্ত আমার বুক ঢিপঢিপ করে।

কেয়া বলে,

ঠিক এসে যাব, তোমার কোনো ভয় নেই, রোজ আসব, যদ্দিন বলবে। তবে এই শনিবারের পরের শনিবার নয়। সেই শনিবার আমরা দল বেঁধে বর্ধমান যাচ্ছি। মস্ত মিটিং সেখানে, ওখানকার এক-আধটা আপিসও আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে। তা হলে আরো বেশী সরকারী সাহায্য পাওয়া যাবে।

কেয়া বর্ধমান যাবে!

অলিমাসিমার রক্তস্রোত দ্রুততালে বইতে থাকে।

বর্ধমানে যাবে? সত্যি তোমরা বর্ধমানে যাবে, কেয়া?

কেয়া বলে, তাই তো ইচ্ছে।

তারপর অলিমাসিমার বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে বলে,

কি হয়েছে, মাসি? ওরকম করে চেয়ে আছো কেন?

অলিমাসিমা কেয়ার হাত চেপে ধরেন—যদি যাও বর্ধমানে, আমার একটা কাজ করে দেবে, কেয়া? কিছু কষ্ট হবে না তোমার, ভারি সহজ কাজ।

কেয়া বলে,

নিশ্চয় দেব, মাসি, কি কাজ বল, সম্ভব হলে নিশ্চয় করে দেব।

অলিমাসিমার কণ্ঠরোধ হয়, অস্ফুটস্বরে বলেন,

পরে বলব কেয়া। যদি সত্যি যাও, তখন বলব।

কেয়া হাসে।

কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? না মাসি, সত্যিই যাব। তবে সে শনিবার না হলে, তার পরের শনিবার। সেই অবধি অপেক্ষা করতে পারবে তো?

তার পরের শনিবার অবধি? অলিমাসিমা চল্লিশ বছরের ওপরে অপেক্ষা করে আছেন। এই আজকালই কেমন যেন অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। আজকালই মনে হয় কি জানি, শেষ পর্যন্ত যদি না-ই হয়। হাতের বড় কাছাকাছি এসেছে কিনা, অলিমাসিমার আজকাল তাই ভয় করে।

কেয়া ছাড়া কার না ভয় করে। নেপুর মা'র মেম দেখলেই ভয় হত। নেপুর তো মানুষ দেখলেই ভয়। কারা সব আত্মীয়স্বজন চন্দননগর থেকে এসেছিল, গুড়ের নাগরি-টাগরি নিয়ে। ছেলের বিয়েতে নেমন্তন্ন করতে এল, তা নেপু রেগেই চতুর্ভুজ! কিন্তু সে সত্যিকারের রাগ নয়, সে হল ভয়। আত্মীয়স্বজন কেউ এলেই নেপুর ভয়। বলে,

কেন আসে? কি চায় ওরা, অলিমাসি? কই, আমি তো যাইনে কখনো কোনো আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে। ওরা কি মনে করে আসে, সে আমার অজানা নেই, মাসি। ভাবে এত সম্পত্তি ভোগ করবে কে? ভাবে আমাদের ছেলেপুলে নেই, নিজেদের নামে লিখিয়ে নেওয়া শক্ত হবে না। ছেলেপুলে নেই তো, ওদের কি মাসি? ওরা দিয়েছিল টাকা?

পুরোনো লোম-ওঠা লাল মখমলের চেয়ারখানাতে বসে পড়ে নেপু; যা মনে হয় বলে যায়,

কিন্তু ওরা কেউ জানে না কারো কিছু পাবার জো নেই। ওঁর টাকা সব যাবে হাসপাতালে, আর বাবার সম্পত্তি পাবে ঐ আনন্দ। আনন্দর কি স্বাস্থ্য দেখেছ, অলিমাসি! আবার আমাকে খোঁড়ে! ওর মামার বংশে ছেলে বাঁচে না, জানো? সবার ঘরে ছুটো একটা জন্মায়, পঁচিশ বছর বয়স না হতেই খতম। কাকাও তো ত্রিশ পার হয়নি। আর আনন্দের শরীরটা একবার চেয়ে দেখ। লাল টকটক করছে স্বাস্থ্য। কখনো অসুখ হয় না ওর জানো অলিমাসি? অথচ এখানে তো ঐ রান্নাঘরের সামনে পাত পেড়ে মানুষ। কি জানি। আচ্ছা, অলিমাসি, আনন্দকে তোমার কেমন লাগে, সত্যি বল তো।

আনন্দকে কেমন লাগে? অলিমাসিমা অবাক হয়ে আবিষ্কার করেন কাউকে কেমন লাগাটা তাঁর জীবন থেকে একেবারে বাদ পড়ে গেছে। কাউকে কেমন লাগে, মুখ ফুটে কখনো তো বলেনই নি, নিজের মনেও কখনো তলিয়ে দেখেন নি।

কেমন লাগত নেপুর বাবাকে? নেপুর মাকে? নেপুর বাবা। কি রূপ, কি শক্তি, রাজার মতো চোখ ঝলসে দিতেন—ভালো-লাগা, মন্দ-লাগার জায়গা রাখতেন না। তাঁকে আবার ভালোমন্দ লাগবে, অলিমাসিমার আস্পর্ধা কতখানি?

নেপুর মা। ছু হাতে তাঁর সেবা করেছেন অলিমাসিমা, ছু হাত পেতে তাঁর প্রসাদ নিয়েছেন। অকাতরে দিতেন। সে দান ওঁর গায়েও লাগত না। এ বিছানার চাদরটা কেমন চকচকে মতো, ওতে আমি শুতে পারব না, নে অলি। আমার কালো চটিটা আর ভালো লাগে না, অলি, তুই পরিস। দেখ, মেজমা কি সুন্দর ফরাসী বোনা স্কার্ফ পাঠিয়েছেন, তুই আমার পুরোনো সাদাটা নিস, অলি, ঐ কোণাটা সেলাই করে নিস।

আরো কত কি দিতেন যা অলিমাসিমার কোনো কালেও কোনো

কাজে লাগতে পারে না। রেশমী রুমাল, জাপানী হাতপাখা, জরির হ্যাণ্ড-ব্যাগ, স্যাটিনের জুতো। সব হাত পেতে নিয়েছেন অলিমাসিমা। প্রসাদ কি কখনো ফিরোতে আছে? সব নিয়েছেন, পরে বটফলের বাবার পুরোনো জিনিসের দোকানে বেচে দিয়েছেন। যা দাম তিনি ধরে দিয়েছেন তাতেই অলিমাসিমা ছেড়ে দিয়েছেন, কোনোদিনও দরদাম করেন নি।

সেই থেকেই ওদের পরিবারের সঙ্গে অলিমাসিমার ঘনিষ্ঠতা। মনে আছে বটফলের বাবার মরার সময়—কি আজেবাজে কথাই যে মনে পড়ে অলিমাসিমার, নিজের চিন্তার কোনো খেই থাকে না। হ্যাঁ, নেপুর মাকে অলিমাসিমা সারাজীবন উপযুক্ত ভাবে সম্মান করে এসেছেন। ভালো-মন্দ-লাগার কথা মনেও আসে নি।

বোধ করি উত্তর চায়ও নি নেপু, এমনি কথাটা বলেছিল। অলিমাসিমা অন্যমনস্কভাবে দেয়ালের দিকে চেয়ে ভাবেন, ভালো-লাগা-লাগির কথা ওঠে সমানে সমানে। যেমন হিংসেও হয় সমানে সমানে। সূর্যকে কি কেউ হিংসে করে? আনন্দ কি আর অলিমাসিমার সমান, যে ভালো লাগবে, বা মন্দ লাগবে।

তবে নেপুর পেছনে সে যে বড্ড লাগে, সে কথাও সত্যি। চোখ দুটি মিটিমিটি জ্বলে, মুখে নানারকম মজার কথা বলে। নিষ্ঠুর সব মজার কথা, এমন সব নির্মম কথা, যার আঘাতে নেপুর মনটার ওপর থেকে সব আবরণ ছিঁড়ে উড়ে যায়, ন্যাড়া মনটা সকলের চোখের সামনে ধরা পড়ে যায়। চোখ ঢাকতে ইচ্ছে করে।

তবু চোখের সামনে বারে বারে ভেসে ওঠে ছোট একজন আনন্দ; নেপুর বাবার ছোট ভাইএর ছেলে আনন্দ; ফর্সা রং, কোঁকড়া চুল, সুন্দর একজন আনন্দ; কিছুতেই একতলার ঘরে থাকবে না সে-আনন্দ, বারে বারে ঘুরে ঘুরে দোতলায় উঠে আসবে, বসবার ঘরে ঢুকবে,

নেপুর বাবা-মা'র অতিথিদের সামনে গিয়ে বসে থাকবে, খাবারের ভাগ নেবে ; সে আনন্দকে নেপুর বাবা মা কিছু না বললেও, সুবিধে পেলেই নেপু দূর করে তাড়িয়ে দিত ; ছ্যাঁচোড় বলত, ছোটলোক বলত, মামার বাড়ির দৈন্যদশা নিয়ে টিটকিরি দিত, এমন এক আনন্দ ; নেপুর সন্তানের বয়সী ছোট্ট এক সুন্দর আনন্দ। সে আনন্দকে তখন অলি-মাসিমা যেন দেখেও দেখতেন না। এখন সে অলিমাসিমার দৃষ্টিতে বারে বারে ফিরে আসে, এখনকার এই আনন্দকে আর সাদা চোখে দেখতে দেয় না !

নেপু বসে থেকে থেকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, অলিমাসিমা, নারকোল গাছে ক'টা নারকোল হল এবার ?

অলিমাসিমা বলতে পারেন না, নারকোলের কথা আদৌ মনেই ছিল না তাঁর, জামাইয়ের এত অসুখ গেল।

সে কি, অলিমাসিমা, নিচের ঘরে তুমি যেখানে রাঁধো, তারই সামনে তো নারকোল গাছটা।

তাও সত্যি। উঠোনে তো ঐ একটিমাত্র গাছ, আর তো কোনো গাছের সঙ্গে অলিমাসিমার সম্পর্কই নেই। কথাটা মনে না পড়া ঠিক হয়নি। নেপু খুঁতখুঁত করে।

গাছপালার সঙ্গে ঐ ছাড়া তো আমাদের কোনো সম্পর্কই নেই। পেছনের বাগানে কি হয় না-হয় সে তো নকুড়বাবুই জানেন, তার সঙ্গে আমাদের শুধু টাকার সম্বন্ধ। কিন্তু এ গাছটা আমাদের নিজেদের, এটার কথাই ভুলে গেলে !

অলিমাসিমার নয়ন জুড়ে আছে আরেকটা গাছ, ডালপালা মেলে, দোতলার সমান উঁচু একটা হিমসাগর আমের গাছ, তাতে মেঘের মতো ফল ধরে নিশ্চয়। কে জানে, দাদারা খায়, না বেচে দেয়। এ বছর তো টাকায় মোটে চারটে গেল। হয়তো দু শ আম ধরেছিল, দাদা

তাহলে পঞ্চাশ টাকা পেয়েছে। সে পঞ্চাশ টাকা দাদা নেয় কি করে, সে তো অলিমাসিমার টাকা।

ফলপাকুড়ে অবিশ্যি অলিমাসিমার কোনো লোভ নেই। কোনোদিনই ছিল না। কোনো খাবার জিনিসেই ছিল না। এখন না খেলে বটফলরা দুঃখিত হয়, হাতে করে তৈরী জিনিস নিয়ে আসে, এমন কিছু বড়লোকও নয় তারা, তাই নিতে হয়। নইলে কি খেলেন না-খেলেন সেদিকে অলিমাসিমার মনই নেই।

আর শুধু খাওয়া কেন? এইতো এককালে এ বাড়িতে এত বিলাসিতা ছিল, তার মাঝেও তো অলিমাসিমা বাস করেছেন। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত বিলাসের জিনিস নাড়াচাড়া করেছেন, কই কখনো তো হাতে তুলে কিছু নিয়ে নিতে ইচ্ছে করেনি।

ফরাসী সেণ্ট-ই আসত কত রকমের। ছোট্ট ছোট্ট শিশি, সোনালী রিবন দিয়ে মালার মতো করে গাঁথা, একেকটা শিশিতে এক এক রকম সুগন্ধ। প্রকাণ্ড পিপের মতো কাঁচের বোতল, তার মুখে একটা লাল রেশমী সুতোর পাম্প লাগানো, সেটি একটু চেপে ধরলেই নল দিয়ে মিহি ধোঁয়ার মতো সুগন্ধ বেরোত। নেপুর মা বেরুবার আগে চুলে দিতেন। কাপড়ের পাটে পাটে ছোট ছোট সবুজ রেশমী থলে করে ল্যাভেণ্ডার রাখা থাকত, চন্দনকাঠের ছিলে থাকত। নেপুর মা মিহি একটা সুগন্ধের ঢেউ তুলে চলাফেরা করতেন।

কড়া কিছু তাঁর মনে ধরত না। ভালো জিনিস না হলে হাত দিয়ে স্পর্শ করতেন না। স্নানের আগে তাঁর জন্য বাদাম বেটে দিতে হত। রবিবার রবিবার রিঠে দিয়ে মাথা ঘষে দিতে হত। পায়ের পাতায় রোজ রাত্রে দুধ ঘষে ঘষে শুকিয়ে দিতে হত।

তখন এক মুহূর্ত সময় হাতে থাকত না অলিমাসিমার। ভারি ভালো লাগত। সপ্তাহে একদিন সন্ধ্যে করে যেতেন বটফলের বাড়ি।

তখন বটফলের সঙ্গে এতটা দহরম মহরম ছিল না, তার বয়সটা নেহাত কাঁচা ছিল। ভাব ছিল বটফলের বড়দিদির সঙ্গে। সে বিয়ে করে বিদেশ চলে যাবার পর থেকে বটফলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। তার সঙ্গে বহুদিন হল চিঠিপত্র লেখাও বন্ধ।

আগে মাঝে মাঝে অলিমাসিমার ভারি ইচ্ছে হত, বটফলদের এ-বাড়ির ঐশ্বর্য দেখিয়ে একেবারে তাক লাগিয়ে দিতে। কিন্তু ওরা আসতে চাইত না। বটফলের কাকা নাকি কিছুদিন এখানে বাজার-সরকারের কাজ করেছিলেন। কি সব হিসেবপত্র নিয়ে গোলমাল হয়, কাকার অবিশ্যি আসলে কোনই দোষ ছিল না, যাই হোক শেষ পর্যন্ত চাকরিটি গেল। তাই বটফলের ভারি লজ্জা করে।

কিন্তু বটফলরা কেন, ওর কাকাও স্বচ্ছন্দে আসতে পারতেন, এ-বাড়িতে কেউ কাকেও মনে রাখত না। অলিমাসিমা জানতেন, এই যে অলি নইলে নেপুর মা'র এক দণ্ড চলে না, আজ যদি অলি চলে যায়, অমনি আরেকটি অলি এসে জুটবে। পুরোনো অলি একটুখানি ফাঁকও রেখে যাবে না।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন অলিমাসিমা। একটা গোটা মানুষ হতে হলে কি কি লাগে? তার কতটা জুটেছিল অলিমাসিমার কপালে?

তুনিয়াতে এমন জায়গা কোথায় আছে যেখানটা অলকানন্দা বলে একজন মানুষ নইলে অসম্পূর্ণ থাকবে, অলকানন্দা ছাড়া আর কিছু দিয়ে যেখানে চলবে না? অলকানন্দা বলতে কষ্ট হয় বলে কেউ সেখানে অলি বলে ডাকবে না?

আছে অমন জায়গা বর্ধমানে। বেয়াল্লিশ বছর না-দেখা জায়গাটির প্রতিটি ঘাসের ফলক যেন মনে পড়ে। তবে ওসব ঘাস তুলে ফেলতে

হবে, তার জায়গায় দুর্বোঘাস লাগাতে হবে, ঘন সবুজ নরম দুর্বোঘাস। আর মনসাগুলোকেও রাখা চলবে না। তারের উঁচু বেড়া দিয়ে তার ওপর মোমলতা উঠিয়ে দিতে হবে। খানিক আব্রু থাকা ভালো।

দাদা হয়তো একটু চটবে ; বলবে,

কেন, আমরা তাকালে কি ওর জাত যাবে নাকি ?

কিন্তু ওদিকটা বন্ধ থাকাই ভালো, দাদার ছেলেমেয়েরা নইলে হয়তো ভারি উৎপাত করবে। হয়তো রাঁধাবাড়া করতে দেবে না। হাত পেতে খালি খালি বলবে, দে পিসি, দে। অমন কথা কেউ কখনো অলিমাসিমাকে বলেনি।

বুকের ভেতর কোথায় যেন ব্যথা করতে থাকে অলিমাসিমার। নারকোল গাছের গুঁড়ির দিকে অন্ধ চোখে চেয়ে থাকেন, কিছু দেখতে পান না, চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে। কোনো খেয়াল থাকে না, ভাতের হাঁড়ি চড়চড় করে ওঠে। চমকে অলিমাসিমা হাঁড়ি নামান।

কোথায় দাদার ছেলেমেয়ে ? তারাও নিশ্চয় আধবুড়ো হয়ে গেছে এতদিনে।

বেয়াল্লিশ বছর কি কম সময় গা ? পাতলা শরীর ছিল অলিমাসিমার তখন। দাদা মোটা মোটা মিলের দশহাতী থান কিনে দিত, জামার জন্য মার্কিন আসত। একটা দাঁতভাঙা চিরুনিও বৌদি দিয়েছিল। ঠাকুরমশায়ের বাড়ি যাবার সময় খবরে কাগজে জড়িয়ে ঐ একখানি কাপড় জামা ছাড়া আর কিছু নিয়ে যেতেও পারেননি।

গামছা ছিল না। তাই দেখে ঠাকুরমশায়ের স্ত্রী বিরক্ত হয়েছিলেন। তাঁকে দোষও দেওয়া যায় না, নিজের গামছা অপরকে দিতে কারই বা ইচ্ছে করে ? অলিমাসিমা কাকেও কখনো নিজের গামছা দেননি। দিতে হয়নি কখনো, কেউ চায়ওনি। শুধু গামছা কেন, কোনো জিনিসই

কেউ চায়নি। লোককে কিছু দেওয়া মানেই অযথা খরচ, দান করবার জন্য যদি ভগবান অলিমাসিমাকে পাঠাত, তা হলে তার ব্যবস্থাও করে পাঠাত। যেমন পাঠিয়েছিল নেপুর মাকে। রাতে বিজলি বাতির আলোতে যদি কাপড় পছন্দ হল, তো দিনের আলোয় সেই কাপড় দেখেই, আর মনে ধরে না। যদি পরা হয়ে গিয়ে থাকে সেই রাত্রেই, তো অমনি রইল পড়ে। পরে কোনো আত্মীয়ের মেয়ের ওপর খুশি হলেন, তাকেই দিয়ে দিলেন। আর নতুন থাকলে দোকানে ফেরত যেত। সেখান থেকে দিনের বেলাতেই গাঁটরি বোঝাই নতুন কাপড় আসত, ইচ্ছেমতো পছন্দ করে নিতেন। একখানি ফেরত গেল, তার বদলে হয়তো তিনখানি রাখা হল।

তবে এসব থেকে অলিমাসিমার সব সময় লাভ হত না, তাঁর যে সাদা থান ছাড়া কিছু পরতে নেই। কিন্তু নেপুর মা শৌখীন মানুষ, মিহি থান আনিয়ে দিতেন ; ঢাকাই থানও পরেছেন অলিমাসিমা। এখন নিজের কিনতে হয়, অতটা ভালো কেনেন না, তবে এগুলোও শান্তিপুরে থান। জামাগুলি আদ্দির। অলিমাসিমার বড় ভয়, কেউ যদি ঝি বলে ভুল করে। সে তিনি সইতে পারবেন না। এদের আত্মীয় তিনি, তাতে এদেরকেও ছোট করা হবে।

বটফলরাও তাই জানে, বড়বাড়ির নিকট আত্মীয়া উনি; বাড়ির মাথাই একরকম বলতে গেলে। সেজন্য যথেষ্ট সমীহও করে ওঁকে। যে মেয়েরা স্বাধীনভাবে রোজগার করে খায় তারা মনে মনে পরমুখাপেক্ষীদের দারুণ শ্রদ্ধা করে, হিংসে করে। আশ্চর্য !

ক্যান্টিনের কাজটার কথা বটফলকে বললে, তারা ভারি অবাক হয়ে যাবে নিশ্চয়। হয়তো তাদের চোখে অলিমাসিমাকে একটু খর্বও হয়ে যেতে হবে। এ পাড়ার মেয়েরা সবাই নিশ্চয় আশ্চর্য হবে ; তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে কতরকম আলোচনা করবে ; ভাববে হয়তো বড়বাড়ির

কর্তার ঐশ্বর্যে এতদিন বাদে ভাঁটা পড়েছে, তাই বিধবা গুরুজনদের দিয়েও কাজ করাচ্ছে !

এঁটো বাসনগুলো নারকোল ছোবড়া আর সোডার গুঁড়ো দিয়ে মাজতে মাজতে অলিমাসিমা ভাবেন। কি জানি, বাসন মাজার ঝি-টাকে নেপু ছাড়াল কেন কে জানে !

এত কথা বটফলরা কিছুই জানে না। আজকাল আর তাদের এ বাড়িতে আনাগোনা অলিমাসিমা মোটে পছন্দ করেন না। আর তারা তো আসতেও চায় না। কিন্তু সমিতির অন্য মেয়েদের ভারি কৌতূহল।

নেপুর বাবার আমলে, বড়দিনের সময় পোস্টাপিসের পিওনরা ব্যাণ্ড বাজিয়ে, এ বাড়ি থেকে কত বখসিস নিয়ে গেছে, পেছনের উঠোনে দাঁড়িয়ে চা-জিলিপি খেয়ে গেছে। তাদের মুখে শোনা গল্প, এরা রুপোর বাসনে খাওয়া-দাওয়া করে ; সে গল্প পোস্টমাস্টার মশায়ের গিন্নীর দৌলতে এখনো সকলে বলাবলি করে।

তাদের ঠেকানো ভারি শক্ত ; জামাইয়ের ঘাড়ে দোষ চাপাতে হয় নইলে তাদের আস্পর্ধার আর অন্ত নেই।

অলিমাসিমা অবাক হয়ে ভাবেন বেয়াল্লিশটা বছর এমনি-এমনি কেটে গেল, টেরও পেলেন না। তবে ফাঁকা মোজাটা মোটা হয়ে, ভারি হয়ে উঠেছে, সে তো কম কথা নয়। যা ছিল রাতের স্বপ্ন, সেও প্রায় মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছে, তাই আজকাল আর যেন ধৈর্য থাকে না।

কেয়ারা যাবে বলেছে বর্ধমান। অলিমাসিমা ঠিকানা দিয়ে দেবেন, পথ বলে দেবেন। একবার জায়গাটা দেখে আসা ভালো। অলিমাসিমার কাছে জায়গাটার ছোট্ট একটা পেনসিলে আঁকা নক্সাও আছে, ঠাকুরমশায় করে দিয়েছিলেন। ভারি ভালো আঁকার হাত ছিল তাঁর। ধার দিয়ে, ধার দিয়ে, মাপগুলোও লিখে দিয়েছিলেন। চার কাঠার চাইতেও কয়েক ছটাক বেশী, দিব্যি চারকোণা ছিমছাম জায়গাটি।

দেখে আসুক কেয়া। তবে খুঁজে পেতে হয়তো একটু অসুবিধে হতে পারে। ঠাকুরমশায় শেষবার লিখেছিলেন নাকি আশেপাশের পোড়ো জমিগুলোতে সব বাড়ি উঠে গেছে। লোকেদের পছন্দও বলিহারি! আঁস্তাকুড়ের মতো সব জমি, তার ওপরেও বাড়ি তুলেছে।

কে জানে রাস্তাটির নামও বদলে গেছে কিনা, আজকাল তো হ্যারিসন রোডেরও কি যেন একটা নতুন নাম হয়েছে, অলিমাসিমা ঠিক মনে করতে পারছেন না।

তবে কেয়া চালাক মেয়ে, ও ঠিক খুঁজে বের করবে। অবিশ্যি সব কথা ওকে বলা চলে না, নিভৃত অন্তরের কথা অলিমাসিমা মুখ ফুটে কাকেও বলতে পারেন না। বড় একটা বাড়ি, তার পেছনে অলিমাসিমার জমি, এটুকু অবিশ্যি বলা চলে। নইলে কেয়া হয়তো নজর করে দেখে আসবে না। দাদার বাড়ি না-ই বললেন। শুধু নামটা বললেই হবে।

কেয়া আপিস থেকে ফিরলে তোলেন কথাটা অলিমাসিমা।

যাচ্ছ তো ঠিক, কেয়া? এই শনিবারই যাবার কথা না? আমার কথাটা মনে আছে?

বড় বেশী আগ্রহটা চেপে রাখতে হয়, গলাটা কেমন ধরা-ধরা শোনায়।

কেয়া বলে,

সেইরকমই তো ঠিক আছে, মাসি, তবে জানোই তো আপিসের সব ব্যাপার। কর্তারা যেই টের পাবেন পুঁটিমাছরা কিছুতে আনন্দ পাচ্ছে, অমনি সেটি বন্ধ না করা অবধি তাঁদের শান্তি থাকবে না।

অলিমাসিমা বলেন,

এ ভারি অন্যায়, শনিবারের বিকেলের দিকে তোমরা কি কর-না কর, ওঁদের তাতে কি?

নয় কিছুই ; ঐ আর কি। দিল হয়তো অলককে এক্সট্রা ডিউটি চাপিয়ে। কিছুই বলা যায় না।

অলিমাসিমা চিন্তিত হয়ে পড়েন।

যাচ্ছে অলকও তোমাদের সঙ্গে ?

কি মুশকিল, ও না গেলে চলবে কেন ? ও-ই তো সেক্রেটারি। বলেছিলাম না তোমাকে মাসি, ও সেক্রেটারি আর আমি ট্রেজারার, হিসেবপত্র সব আমার হাতে। দুজনার সই দিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা-পত্র তুলতে হয়। আর দুদিন বাদেই সরকারী টাকাটাও এসে যাবে, তখন একেবারে হাজার হাজার টাকার কারবার হয়ে দাঁড়াবে। ইচ্ছে করলে দুজনে সই দিয়ে, টাকাটি তুলে, একদম ভেগে পড়তেও পারি। কেউ ঠেকাতে পারবে না।

কি বিশ্রী সব কথা কেয়ার। কোন একটা গাম্ভীর্য নেই। কিন্তু অলক গেলে হয়তো সবসময় কেয়ার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে, টুক করে একবার গিয়ে জমিটা দেখে আসার সুবিধে হবে না।

কেয়াকে কথাটা না বললেই নয়।

আরে, না না। এতই যখন গোপন ব্যাপার, অলককে না জানিয়েই দেখে আসব। তবে খুঁজে বের করা মুশকিল হতে পারে। ও বর্ধমানে অনেকদিন ছিল। পথঘাট ওর সব চেনা।

বেশ, না হয় ওকে সঙ্গে নিয়েই যেয়ো, কিন্তু জমিটা যে আমার তা যেন আবার ওকে বোলো না। হারাধন মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি আছে, তার পেছনেই, একেবারে লাগোয়া চার কাঠা জমি।

কেয়া একটু অবাক হয়। বলে, কি এত গোপন কথা বুঝলাম না ; তবে যখন বারণ করছ, ওকে আর তোমার নামটা বলব না. বলব আমার এক আত্মীয়ের জমি। কেমন, তা হলে হবে তো ?

অলককে ভালো লাগে না অলিমাসিমার। কি রকম একটা

রুক্ষরুক্ষ অগোছালো ভাব, খদ্দরের কাপড়-জামা পরে, চুলগুলো বড্ড লম্বা, কেমন একটা চালাক-চালাক ঢং ; দেখলেই অলিমাসিমার গা জ্বালা করে।

ঠিক অভদ্র নয়, বরং বেশ ভদ্রভাবেই কথা বলে। কিন্তু সব কথার মধ্যে এ-বাড়ির, আর শুধু এ-বাড়ির কেন, সব বনেদী বাড়ির প্রতি কেমন একটা খোঁচা দেওয়া থাকে। যেন এরা চেষ্টাচরিত্র করে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করে, ভারি একটা অন্যায় করেছে।

ও-ই নাকি বর্ধমানে ছিল! কোন্ দিকটায় থাকত কে জানে। বর্ধমান তো আর একটুখানি জায়গা নিয়ে নয়। তবু জায়গাটা হয়তো ওর দেখাও হতে পারে, হয়তো বা জিজ্ঞেস করলেই বলে দিতে পারবে। কিন্তু ঐ রকম ছেলের কথাতেই বা বিশ্বাস কি। তারপর এখনি জমির কথা জানিয়ে দিলে, সেখানে যদি খবর-টবর দিয়ে বসে। দাদা হয়তো বলবে,

ওঃ! ভারি আমার জমিদারনী হয়েছেন! ওঁর ঐ চারকাঠার জমিদারী দেখে আসবার জন্য আবার চর লাগিয়েছেন!

ঐরকম কথাবার্তাই যে দাদার। অলিমাসিমা এখন আর ওসব সইতে পারবেন না। এককালে অনেক সয়েছেন। উঠতে-বসতে খোঁটা। খাওয়া নিয়ে খোঁটা। বিধবা মানুষের রাত্রে কেন আবার খিদে পায়, তাই নিয়ে কি সব বিশ্রী খোঁটা। স্বামী খেয়ে পেট ভরেনি, এইরকম সব কথা। কেয়াকে বলেন,

কেয়া, কথা দাও, বর্ধমানে পৌঁছবার আগে অলককে তুমি এ-বিষয়ে কিছু বলবে না। নেহাত যদি খুঁজে না পাও, শুধু তখনি বলবে।

কেন এত ভাবো, মাসি? বলেছি তো, চুপি চুপি কাউকে না জানিয়ে দেখে আসব। একা খুঁজব, আবার না পেলে অলককে নিয়ে খুঁজব, অত কি আর সময় পাব, মাসি? মিটিংটা থাকবে তো।

তবে সেটা সন্ধ্যেবেলায়, শেষ ট্রেনে ফিরব আমরা। অনেক রাত করে বাড়ি আসব। তুমি গয়লাকে বলে রেখো, আমি ডাকলে, ও যেন খিড়কি খুলে দেয়। ওকে সেজন্য আট আনা পয়সা দেব।

অলিমাসিমা ভাবেন, তা হলে শনিবার রাত্রে আর খবরটা পাব না, সেই রবিবার সকাল অবধি অপেক্ষা করতে হবে। কি করে কাটবে রাতটা কে জানে।

নেপুদের খাবার সময় হয়ে যায়। অলিমাসিমাকে উঠতে হয়। ট্রেতে বাসন সাজান, কেয়া অনর্গল বকে যায়।

জানো মাসি, আমাদের আপিসে তুজন ছোটসায়েব আছেন? তাঁদের মধ্যে একজন আবার মহিলা।

তা হলে ছোট মেম বল।

না, মোটেই মেম নয়, একদম বাঙালী ছোটসায়েব। হিঁতুবাড়ির মেয়ে নাকি, কালো বলে স্বামী নেয়নি, সুন্দর দেখে আবার বিয়ে করেছে। তাই ছোটসায়েবের বাবা মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে, এম-এ পাস করিয়ে, কোন্ মন্ত্রী না কাকে ধরে, দিয়েছেন আপিসে ঢুকিয়ে। এদ্দিনে সে ছোটসায়েব হয়েছে। কি তার প্রতিপত্তি জানো না, মাসি, পিওনরা থরহরি কম্পমান, বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায় ওর ভয়ে।

কেয়া খুব হাসে। কেয়া বলে,

আরো শোনো, মাসি। দিল্লী থেকে বদলি হয়ে এল মুকুন্দবাবু বলে এক কেরানী। ক্যাবলার একশেষ, আর এই বড়-বড় কথা, কাজ ফেলে দিনরাত তক্কাতক্কি। আর পড়বি তো পড় একেবারেই ছোটসায়েবের সামনে! সক্কলের সামনে ছোট সায়েব দিলে তাকে তুলো ধুনে। আর সে শুধু ভূত দেখার মতো চেয়ে রইল!—বিশ্বাস করবে, মাসি, ঐ নাকি ওর সেই স্বামী!

অলিমাসিমা এবার সত্যি আশ্চর্য হন।

তাই নাকি? এখন স্ত্রী বড় চাকরি করে, এতদিনে বোধ হয় মিটমাট হয়ে গেল।

মিটমাট? কি যে বল, মাসি, তিনটি মাস ছোটসায়েব তাকে নাকের জলে চোখের জলে করলে। শেষটা সে নিজে থেকে ট্র্যান্সফার চেয়ে চলে গেল সাহেবগঞ্জে! হয় কখনো মিটমাট? কি যে বল!

অলিমাসিমা বলেন,

কিন্তু সে তো জোর করতে পারত? স্বামীর তো আইনের জোর থাকে। ওঁর সব রোজগারটি যদি কেড়ে নিত, উনি একটু টুঁ শব্দও করতে পারতেন না। পোস্টমাস্টার মশায়ের শালীর বদমাশ স্বামী তাই করে, তার কিছু করবারো উপায় নেই!

কেয়া হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়।

কে বলেছে উপায় নেই? তোমার ওসব আইন পালটে গেছে। ইচ্ছে করলেই উনি ওঁদের বিয়ে ভেঙে দিতে পারেন। দিয়েছেনও হয়তো, কে জানে। আমারও তো তাই ইচ্ছে করে।

কেয়া হাসে, কিন্তু মুখটা একটু সাদা মনে হয়। না, কেয়াকে চটানো নয়। অলিমাসিমা যত্ন করে ট্রে সাজিয়ে ওপরে চলে যান। রোজকার মতো ভারি ট্রেখানি কেয়া সিঁড়ি দিয়ে তুলে দিয়ে আসে।

বাসন নিয়ে আধঘণ্টা বাদে নেমে এসে দেখেন কেয়া শুয়ে পড়েছে।

বুকটা ধড়াস করে ওঠে। এই সময় কেয়ার অসুখ করলে কি হবে? শনিবার যদি যেতে না পারে?

অলিমাসিমার পায়ের শব্দ শুনে, বালিশ থেকে মাথা তুলে কেয়া বলে—

তুমি খেয়ে নাও, মাসি, আজ আমার খিদে নেই, ক্লাবের কমিটি মিটিং-এ জোর চা খাইয়েছে।

সত্যি-মিথ্যা ভগবান জানেন। যাক, তবু শরীর যে খারাপ করেনি সেই যথেষ্ট। কে জানে কি ভাবে ও, কাউকে তো কখনো কিছু বলে না। অলিমাসিমাই বা কাকে তাঁর মনের কথা বলেছেন।

নেপুরা খেয়ে-দেয়ে সকাল-সকাল শুয়ে পড়ে। ন'টার পর আর নিচে নামবার উপায় থাকে না। সিঁড়ির মাঝখানকার দরজার তালার বড় চাবিটা এইখানে, অলিমাসিমার পায়ের কাছে, দেরাজের ওপর থাকে। নিচে যাবার জন্য প্রাণ আইঢাই করে, তবু অলিমাসিমা নিচে থেকে নিঃশব্দে একবার ঘুরে আসার কথা মনেও করতে পারেন না।

নেপুর মাঁর কোনো কথারই অমর্যাদা করেন নি কখনো। কারণও জানতে চান নি। অদ্ভুত সব হুকুম দিতেন মাঝে মাঝে নেপুর মা। নিচের তলার সামনের দিক্‌কার বড় হলঘরের পাশে নেপুর বাবার পড়বার ঘর, অনেক রাত অবধি সেখানে তিনি পড়াশুনো করেন। হঠাৎ হঠাৎ অলিমাসিমার হাতে দিয়ে খাবার জল পাঠিয়ে দিতেন রাত-দুপুরে।

নেপুর বাবা হেসে জলটি নিয়ে, জানলা দিয়ে গলিয়ে বাইরে ফেলে দিতেন। তার পর খালি গেলাস অলিমাসিমার হাতে দিয়ে বলতেন, যাও, এবার নিশ্চিন্ত করে দাও। অলিমাসিমা খালি গেলাস নিয়ে গুটি-গুটি ওপরে এসে সব কথা বলতেন। জল ফেলে দেওয়ার কথা শুনে, নেপুর মা-ও একটু হাসতেন, কিন্তু দুদিন বাদে, আবার পাঠাতেন।

এই ঘরেই শুয়ে থাকতেন অলিমাসিমা, ও-ঘরে নেপুর মা-বাবা শুতেন, মাঝখানকার ভারি দরজাখানি বন্ধ থাকত, পাশের দরজা দিয়ে অলিমাসিমা যাওয়া-আসা করতেন।

ঘরখানি তখন অন্যরকম ছিল। মেঝেতে পুরু হলুদ রঙের গালচে

পাতা ছিল। অলিমাসিমার বিছানার ওপরেও দিনের বেলায় মোটা হলুদ রেশমী ঢাকনি পাতা থাকত। ঘরময় কি যে একটা সুগন্ধ ভুরভুর করত, যে এসে দু দণ্ড এ-ঘরে দাঁড়িয়েছে, তারই গায়ে অনেকক্ষণ অবধি লেগে থাকত।

রাতে যেই আলো নিভিয়ে দিতেন, অমনি ছায়াময় ঘরখানি যেন আরো অপরূপ হয়ে উঠত। তার মাঝখানে শুয়ে শুয়ে অলিমাসিমা চোখের সামনে দেখতে পেতেন বর্ধমানের গলির ভেতর চারকাঠা মাপের একফালি জমি, আশেপাশের পোড়ো জমি থেকে আলাদা হয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে।

ঘরখানি আর তখন নীরব থাকত না, অলিমাসিমার বুকের স্পন্দনকে ছাপিয়ে ঝাঁপতালের সুর বেজে উঠত! ঝাঁপতাল কাকে বলে জানেন না অলিমাসিমা; নিভৃতে যে বাজে, ভাবেন সেই বুঝি ঝাঁপতাল। মনের ভেতরকার যে সুর, সেই বুঝি ঝাঁপতাল।

শনিবার আর আসতে চায় না। এর মধ্যে আনন্দ আরেকবার জামাইয়ের খোঁজ নিয়ে গেল। সঙ্গে করে জামাইয়ের বন্ধু ঘোষকেও নিয়ে এল। আধাবয়সী আমুদে ভদ্রলোক, রং-জ্বলা, লোম-ওঠা, লাল মখমলের চেয়ারখানিতে বসে কত কি বলে গেলেন। দোকান থেকে গয়লা গিয়ে খাবার কিনে আনল, অলিমাসিমা চা করে দিলেন। মাঝমানে কেয়া এসে পড়ল, তাই শুনে জামাই আনন্দকে পাঠিয়ে তাকে ধরে আনল। কেয়া হাসিমুখে এসে ঘরে ঢুকল। অলিমাসিমা তার দেমাক দেখে হার মানলেন, এত অহঙ্কার যে জেদ করে নিজের দাম বাড়াতেও কখনো চেষ্টা করবে না।

ওদের সঙ্গে বসে চা-জলখাবারও খেল কেয়া। পরে, ঘোষ বিদায়

নেবার পর, নিচের খাবার ঘরে আনন্দের সঙ্গে কেয়ার সে কি ঝগড়া! কেয়ার বড়সাহেবের কাছে ইউনিয়ন নিয়ে কেয়ার মাতামাতির কথা শুনে আনন্দ রেগে চতুর্ভুজ।

অলিমাসিমার সামনেই দুজনে দুজনকে কি সব কাটা-কাটা জ্বালা-ধরানো কথা বলতে লাগল। তার চাইতে ছোটবেলাকার মারপিটও যেন ভালো ছিল।

অলকের নামে যা-তা বললে আনন্দ। তিনটে আপিসে এই সব করে নাম কাটিয়ে এখানে এসে জুটেছে। ওর সঙ্গে এত মাখামাখি কিসের। যত রাজ্যের বাজে ছেলে পাণ্ডা হয়ে দাঁড়িয়েছে ওদের ইউনিয়নের, বড়সাহেবের নিজের মুখে শোনা। এতদিন পরে কেয়া নিজের চাকরির না অসুবিধা করে। আরও পাঁচটা মেয়েও তো ঐ আপিসে চাকরি করে, তারাও তো ইউনিয়নের মেম্বার, কই তারা তো কেয়ার মতো নাচানাচি করে না। কেয়া তো আর কচি খুকীটি নেই, ওর কত বয়স আনন্দের খুব জানা আছে। মোট কথা, শনিবার বর্ধমান যাওয়া কোনমতেই হয় না।

কেয়া যে কখনো রাগে না, সেও যেন আজ একটু গরম হয়ে উঠল। এতগুলো কথা আনন্দ না হয় না-ই বলত। বাস্তবিকই কেয়া বর্ধমান যায় না-যায়, আনন্দের তাতে কি? কেয়ার গলা একটুও উঠল না, স্বরটা কিন্তু কি রকম কাঠ-কাঠ শোনাতে লাগল। কথা-গুলোও ভারি নির্মম। আনন্দের আত্মসম্মানে আঘাত-দেওয়া কথা।

অলিমাসিমার বুক ঢিপঢিপ করে। যেরকম জেদী ছেলে আনন্দ, শেষটা না বড়সাহেবকে বলে, ঐ যে কেয়া বলেছিল ডিউটি ফেলে দেয়, তাই না করে। আর চুপ করে থাকতে পারেন না অলিমাসিমা।

ও আনন্দ, বর্ধমানে ও শুধু মিটিং-এর জন্যে যাচ্ছে না, আমারো একটা কাজ করে দিতে যাচ্ছে।

ওরা দুজনেই হঠাৎ থেমে গেল। আনন্দ আরো কিছুক্ষণ ছিল, তার মধ্যে নেপু নেমে এল।

ওকি, তুমি এখনো যাওনি, আনন্দ? কিছু দরকার আছে?

আনন্দ তেমনি হেসে বলে, দরকার তো সর্বদাই আছে, নেপুদি, কিন্তু তোমার কাছে কি কিছু পাওয়া যাবে? ছোটবেলায় তো আমাদের চা থেকে চিনিটুকু মেরে দিতে।

নেপু রাগে বাক্যহারা হয়, আনন্দ হেসে বিদায় নেয়। নেপু কেয়ার দিকে ফিরে বলে,

অত হাসির কি হল, কেয়া? যত সব অভদ্র কথা শুনতে খুব মজা লাগে, না? আর তুমিও কি বলে ওকে আস্কারা দাও অলিমাসি? ওর মনের ভাব কি রকম, বলিনি তোমাকে এক শ বার? উনি আসতে বলেন, ওঁর সঙ্গে দেখা করে চলে যাবে। মেয়েদের সঙ্গে অত কি গল্প, এদিকে ঢুকতেও দেবে না বলে দিলাম, মাসি। ও লোক সুবিধের নয়।

অলিমাসিমা বলেন,

তোমার আপনার খুড়তুতো ভাই, নেপু, আমাদের মুখে কি অমন কোনো কথা শোভা পাবে?

নেপু বলে, বেশ, তাহলে আমিই বলে দেব। তবে শুনবে বলে তো মনে হয় না। বাবার একটা কোনো আক্কেল ছিল না, নইলে দেয় কখনো অমন ছেলেকে সম্পত্তি! একটা লক্ষ্মীছাড়া, বাউণ্ডুলে! ভদ্রঘরের ছেলেদের মতো বিয়ে-থা করলো না, যা-তা করে বেড়ায় নিশ্চয়ই, মাইনে তো পায় অনেক শুনেছি। দেখো তুমি, বাঁচবে বহুদিন, ওর কোনোদিন কিছু হবে না।

কেয়া হঠাৎ ঘর ছেড়ে চলে যায়। নেপু একটু থেমে কষ্টে হেসে বলে,

ওঃ! আনন্দর নিন্দা করছি, অমনি রাগ হয়ে গেল বুঝি? তোমাদের কেয়ারটিও কম যায় না। বড়লোক আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে যারা অমনি-অমনি মানুষ হয়, তাদের ধরনই আলাদা হয়, অলিমাসি, সারাজীবন খেটে খেলে, তুমি তার কি বুঝবে।

নেপু চলে গেলে অলিমাসিমা ভাবেন, সারাজীবন খেটে কি বা খেলাম? চল্লিশ বছরে সাত হাজার টাকা।

নিজের ছোট ঘরখানিতে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন। আলো না জ্বাললে সন্ধ্যেবেলায় আবছায়াতে ঘরখানাকে কেমন যেন লাগে। মেহের আলির কথা মনে হয়। ঐ তাকের সামনে উঁচু টুলে বসে থাকত। সাহেব যতক্ষণ বাড়িতে থাকবে, মেহের আলি সাদা পোশাক পরে ওখান থেকে নড়বে না। সাহেবের সঙ্গে কোর্টে যেত আসত। এসেই সাহেবের জলখাবার গুছিয়ে দিয়ে, আবার ঐখানে বসে থাকত। গলা তুলে ডাকতেও হত না, সায়েব একবার ওর নামটি উচ্চারণ করলেই হল, অমনি গিয়ে হাজিরা দেবে। কে জানে কি করে বুঝত।

খাবার ঘরের আর এ-ঘরের মাঝখানে এতখানি দেয়াল কাটা ছিল, সেই দিকে মেহের আলির চোখ থাকত। খাবার ঘরের দরজায় ঘি-রঙের লেসের পর্দা ছিল। তার মধ্যে দিয়ে ওপারের বৈঠকখানা দেখা যেত, সে দিকে চেয়ে মেহের আলির দিন কাটত।

হঠাৎ রাতে ঘুম ভেঙে গেলে অলিমাসিমার মনে হয়, ঐ জায়গাটাতে উঁচু টুলে এখনো বুঝি মেহের আলি বসে আছে। সামনের দেয়ালের ফাঁকাটুকু নেপু কবে ইঁট দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে, তবু সেই নীরেট দেয়ালের দিকে চেয়ে মেহের আলি বুঝি মনিবের অপেক্ষায় বসে আছে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অলিমাসিমা ভাবেন, খেটে খেত মেহের আলি, শুধো মাইনে পেত চল্লিশ টাকা, বাড়িতে অনেকগুলি পোষ্য ছিল।

নেপুর বাবা চোখ বুঁজবার পরদিনই নেপু তাকে জবাব দিয়ে দিয়েছিল। মেহের আলিও তখন বুড়ো হয়ে গেছে, পা দুটো খুব ফুলতো মনে আছে। নেপু বলেছিল, কে জানে, হয়তো ছোঁয়াচে কিছু, ওসব ঝামেলা পুষতে নেই। দিয়েছিল এককথায় ছাড়িয়ে। মেহের আলি সেই যে সেলাম করে চলে গেল, আর কোনো খবরও দিল না। সেরকম কিছু তখন মনেও হয় নি অলিমাসিমার।

খেটে খেত মেহের আলি, অলিমাসিমার মতো। সে চলে যাবার বহুকাল পরে দেশ থেকে তার বৌ কেঁদেকেটে চিঠি লিখেছিল মেহের আলি কেন চিঠি দেয় না, খরচ পাঠায় না, তাদের বড় কষ্ট। নেপু চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। বলেছিল—

কোথায় মজা লুটছে কে জানে। এইসব খেটে-খাওয়া লোকদের জাতই আলাদা।

জামাইয়ের শরীর অনেক ভালো। শরীর ভালো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জামাই যেন আবার তার খোলসের মধ্যে ঢুকে যেতে লাগল। মাঝখানে একটু প্রগল্‌ভ হয়ে পড়েছিল, যাকে পেত তার সঙ্গে যেচে কথা বলতে চাইত। আনন্দ কিন্তু সে সুযোগ ছাড়েনি। জামাইকে ডাক্তার একটু বেড়াতে বলেছে। ব্লাড-প্রেসারের রুগীদের মোটরে বেড়ালে রোগ বাড়ে, এই বলে নেপু মহা আপত্তি করেছিল। আনন্দ তার নিজের গাড়ি করে, নিজে চালিয়ে, গঙ্গার ধার থেকে রোজ একবার করে জামাইকে বেড়িয়ে আনতে লাগল।

নেপু ভেবে সারা, আনন্দ কোথায় কোনো অনিষ্ট করে না বসে। অলিমাসিমা ভাবেন আনন্দের আগ্রহের কারণটা কি শুধু জামাইয়ের প্রতি ভালোবাসা, না তার সঙ্গে নেপুকে রাগাবার ইচ্ছেও খানিকটা আছে।

রোজ ফিরে এসে জামাইকে ওপরে পৌঁছে দিয়ে, এদিক থেকে

একবার ঘুরে যায়, রোজ একবার কেয়াদের ইউনিয়নের খবর নেয়, কিন্তু আর ঝগড়া করে না।

এমনি করে শনিবার আসে।

দিন আর কাটতে চায় না। সকাল থেকে অলিমাসিমার উত্তেজনায় পেট ব্যথা করতে থাকে। কেয়া নিশ্চিন্ত মনে সব গোছগাছ করে নেয়।

ভুলে যাবে না তো, কেয়া ? এই দেখ ঠিকানা লিখে দিয়েছি, কে জানে রাস্তার নাম বদলাল কিনা। বুঝলে, কেয়া, হারাধন মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির পেছনে লাগোয়া জমি, মাঝখানে একসারি মনসার ঝোপ ছিল, এখনো আছে হয়তো। আর এক পাশে একটা মস্ত হিমসাগর আমের গাছ।

কেয়া ঠিকানা-লেখা চিরকুটটা ভাঁজ করে ব্যাগে রাখে।

কেয়া, এই নক্সাটাও রাখো, যদি খুঁজে পেতে মুশকিল হয়, এই দেখ জমিটার নক্সা, আশেপাশের রাস্তাগুলোও নামসুদ্ধ দেওয়া আছে। তুমি একাই বেশ খুঁজে নিতে পারবে, ঐ অলকের সাহায্য নিতে হবে না।

কেয়া কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত থাকে, মনে হয় ভালো করে বুঝি শুনল না। অলিমাসিমা আবার বলেন,

ভুলো না, কেয়া, লক্ষ্মী মেয়ে—

কাগজ থেকে মুখ তুলে কেয়া জিজ্ঞেস করে,

তোমার অনেক দুঃখের ধন, না মাসি ? তাই অমন করছ ?

অলিমাসিমার গলার কাছটা টনটন করে ; জোর করে বলেন,

না, না, তবে নিজের বলতে ঐ একফালি জমি ছাড়া আর তো কিছু নেই আমার। দেখে এসো নিশ্চয়ই, কেয়া, ভুলো না যেন।

রাঁধাবাড়া নিয়ে অযথা ব্যস্ত হয়ে পড়েন অলিমাসিমা। কেয়া

রওনা হয়। যাবার আগে, গোয়ালাকে দরজা খুলে দেওয়ার কথা মনে করিয়ে দিতে বলে যায়।

একতলায় গভীর শান্তি বিরাজ করে। নারকোল গাছের গুঁড়ির দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবেন অলিমাসিমা, আসুক কেয়া, জমিটার কথা বলুক এসে। তা হলে মনে জোর পাব। বটফলের কাছে কথাটা পাড়তে পারব। নেপুকেও বলতে হবে।

অলিমাসিমার বুকের ভেতরটা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে আসে। নেপুকে বলা খুব সহজ হবে না। নেপু তার হলদে চোখ দিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে থাকবে, দুটো কাঁচের মার্বেলের মতো হলুদ চোখে কোনো ভাবের লেশ থাকবে না। দু-তিনবার করে বলতে হবে অলিমাসিমাকে, নইলে কথাটা তার বোধগম্য হবে না।

রাগ করবে নেপু। এ বাড়ি থেকে অলিমাসিমা কত অনুগ্রহ পেয়েছেন, সব মনে করিয়ে দেবে। বলবে গরিব আত্মীয়স্বজনদের ধরনই আলাদা, যারা খেটে খায় তাদের জাত অন্যরকম।

অলিমাসিমা কোনো কিছুরই প্রতিবাদ করবেন না। জামাইয়ের কানে কথাটা তুলবে নেপু। অলিমাসিমার ভারি লজ্জা করতে থাকে। ছি ছি, জামাই কি মনে করবে!

তার চাইতে দুজনে যখন খেতে বসবে, তখন সামনাসামনি বলাই ভালো। কিন্তু জামাই অবাক্ হয়ে যখন জিজ্ঞেস করবে,

কেন, অলিমাসিমা, কিছু হয়েছে? আমি কিছু করতে পারি না?

তখন কি বলবেন অলিমাসিমা? নেপুর গঞ্জনার উত্তর তো খুব সহজ, চুপ করে থাকলেই হল। কিন্তু জামাইয়ের কথার যে কি উত্তর দেবেন, অলিমাসিমা ভেবে পান না। ক্যান্টিনে কাজ নেবার কারণ প্রাণ ধরে বলতে পারবেন না। টাকার জন্য এতকালের আশ্রয় ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, এ কথা অলিমাসিমা উচ্চারণ করতে পারবেন না।

সারাদিন কেটে যায় অলিমাসিমার ভেবে ভেবে। বিকেলের দিকে আর থাকতে না পেরে, সকাল-সকাল রাতের রান্না সেরে, নেপুকে বলে, আধঘণ্টার জন্য বেরিয়ে পড়েন।

বটফলরা ভারি খুশি হয়। কোথায় যেন গির্জেতে কিসের জন্য টাকা তোলা হচ্ছে, মেলা বসেছে, সেখান থেকে ফিরে, দেরী করে সব চা খাবার তোড়জোড় চলছিল।

বটফলের মা খুব রাগমাগ করছিলেন, কি সুন্দর সব খাবার-টাবার বেচছিল ওখানে, তা বৌমা কিছুতেই কিনল না। কেমন সব লুচি, আলুর দম, শোন-পাপড়ি।

ক্লান্ত ভাবে বটফল বলল,

কেন অবুঝের মতো কর, মা ? ওসব খেলে তোমার অসুখ করবে। আমরাও তো কেউ খাইনি। ববি অতটুকু ছেলে, সে কিছু বলছে না, আর তুমি এরকম করছ ! ছি !

বটফলের মা'র কান্না আসে।

তাই তো বলছি। ও ছোট ছেলে, সারা জীবন ধরে ও খেতে পাবে। কিন্তু আমি যে শিগ্‌গিরই মরে যাব, আমি ওসব আর কোথায় পাব ?

অলিমাসিমা তাঁর ক্রুশ দিয়ে বোনা জালের ব্যাগ খুলে, বটফলের মাকে ছোট্ট এক শিশি জোয়ানের হজমি গুলি দেন।

এবেলা এক বড়ি, ওবেলা এক বড়ি খাবেন, দিদি, শরীর ভালো হয়ে যাবে !

বটফলের মা আহ্লাদে আটখানা, তখুনি শিশি নিয়ে ফসফস করে শোবার ঘরে চলে গেলেন।

তবে সে না ক্যান্টিনের কথাটা পাড়া গেল। শুনে বটফল একটু গম্ভীর হয়ে গেল। লোক তো ওঁরা চাইছেনই, তবে এখন বটফলের

কথা শুনলে হয়। তাছাড়া অলিমাসিমা পারবেন কি অমন ঝক্কির কাজ পোয়াতে, শুয়ে-বসে অভ্যস্ত তিনি।

শুয়ে বসে অভ্যস্ত! আজ পনরো বছরের বেশী বড়বাড়ির সব কাজ অলিমাসিমা এক হাতে করে এসেছেন। অলিমাসিমার কোনো কষ্ট হবে না। মাস-কাবারে যার জন্য এক শ টাকা পাওয়া যাবে, এমন কোনো কাজই নেই যা অলিমাসিমার শক্তিতে কুলিয়ে উঠবে না।

তবে সব কথা কি আর মুখে বলা চলে? অলিমাসিমা বললেন, জামাইয়ের শরীর ভালো না, ঝামেলার কাজের জন্য লোক ওঁদের আরো রাখতেই হবে।

তারপর বটফলের দাদার দিকে চেয়ে একটু মৃদু হেসে বললেন, তাছাড়া দাদা তো সবই জানেন, এখন আমার পেনসান নেবার সময় এসেছে, বাড়িটাও তুলতে হবে। বছর দুই ক্যান্টিনে কাজ করলেই সব টাকাটি উঠে যাবে।

সত্যি তো, বটফলের এত কথা মনে হয়নি। তা হলে অলিমাসি-মাকে একবার নিয়ে যেতে হয় মিস্টার মণ্ডলের কাছে। একটা ভারি সুবিধে হয়েছে যে, অলিমাসিমার বয়স হয়েছে, নইলে যা সাংঘাতিক ভদ্রমহিলা ঐ মণ্ডল সায়েবের গিন্নী! কম বয়সের, কিম্বা ভালো দেখতে কোনো মেয়েকে ঘেঁষতেই দেবে না!

স্থির হল, জামাইকে এখন কিছু বলা নয়, মণ্ডলের সঙ্গে সোমবার দেখা করে, কথাটা পাকাপাকি করে, আসছে মাস থেকে কাজে লাগা। ততদিনে জামাইও নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে। কি আর এমন বয়স জামাইয়ের? বাড়ি ফেরার পথে অলিমাসিমা হিসেব করতে থাকেন। কতই বা বয়স জামাইয়ের? অলিমাসিমার সাতান্ন, নেপুর তা হলে পঞ্চান্ন; কবে যেন শুনেছিলেন, জামাই নেপুর চাইতে মাত্র

তিন বছরের বড়, ওর তা হলে আটান্ন। আটান্নকে কিছু বুড়ো বলা চলে না। চাকর-বাকর নিয়ে ওদের বেশ চলে যাবে।

খিড়কির কড়া নাড়তেই গোয়ালা এসে খুলে দেয়। তাকে যেন একটু বিরক্ত-বিরক্ত মনে হয়।

কখন কেয়া-দিদি ফিরবেন, আর আমাকে রাত জেগে বসে থাকতে হবে ?

রাত জেগে বসে থাকবি কেন, মঙ্গল ? রান্নাঘরের দাওয়াটার ঐ কোণাটাতে খাটিয়া পেতে ঘুমিয়ে থাকিস। মাথার সামনেই দোর। কেয়াদিদির সাড়া পেলেই খুলে দিস। তোকে আট আনা পয়সা দেবে বলেছে।

পয়সার কথা শুনে খানিকটা নরম হয়ে আসে মঙ্গল। তবু বলে,

এত রাত করে আসা কেন, মাসিমা ? পথে কত খারাপ লোক—

অলিমাসিমার আর মঙ্গলের সঙ্গে বকতে ইচ্ছে করে না। সংক্ষেপে বলেন,

শখ করে সে দেরী করছে না মঙ্গল, ট্রেন পৌঁছবেই দেরী করে।

ঘড়ির দিকে চেয়ে চেয়ে দেখেন সবে আটটা বেজেছে। নিজের ছোট ঘরখানিতে গিয়ে কাপড়-চোপড় ছাড়েন। খাটের ওপর চড়ে তাক থেকে কৌটোটা নামান। মাঝখানে গিঁট দেওয়া রেশমী মোজা তেমনি আছে।

খাটে বসে সত্তরটা নোট আরেকবার গুণে রাখেন। তার সঙ্গে একটা দশ টাকার নোটও রেখে দেন, এ মাসের হাতখরচটুকু।

রেশমের বোনা জিনিসে গিঁট ধরে না। কষে এঁটে আরেকটা ফাঁস পরিয়ে, মোজাটা তুলে রাখেন। ততক্ষণে সাড়ে আটটার কাছা-কাছি হয়ে যায়।

আগে ঘড়িটা বাজত। শুধু বাজত না, বাজবার একমুহূর্ত আগে

খট্ করে তুটো ছোট্ট দরজা মতন খুলে যেত। তার ভেতর থেকে চমৎকার সাজগোজ করা একটা সাহেব আর একটা মেম বেরিয়ে আসত, এসে ঐ বারান্দা-মতো জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে, ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজিয়ে, আবার তুদিকের তুটি দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ত।

নেপুর বাবা মারা যাবার পর থেকে কেন জানি ওটা আর বাজে না। কিন্তু ঘড়িটা চলে। কে জানে ভেতরে কোথায় তারা তুজন বছরের পর বছর বসেই আছে।

নেপুদের খাইয়ে, বাসন নিয়ে অলিমাসিমা নিচে নেমে আসেন। নেপুকে বুঝিয়ে নিচে শোবার ব্যবস্থাও করেছেন। জামাই ভালো আছে, নেপুর ভয় গেছে। এখন যেন তারও অলিমাসিমার ওপরে থাকাটা পছন্দ হচ্ছে না। বলতেই, এক কথায় রাজী হয়ে গেল।

অলিমাসিমার সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির অর্ধেকটা নেমে, তালাটা লাগিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হল।

অলিমাসিমা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, খাবার ঘরে পৌঁছে, বাসনগুলি ধুতে আরম্ভ করেন। এমন সময় ভেতর দিক্‌কার দরজা দিয়ে কেয়া এসে ঘরে ঢুকল।

অলিমাসিমা এমন চমকে গেলেন যে, হাত থেকে সবুজ ঘরবাড়ি-ওয়ালা একটা প্লেট পড়ে গিয়ে খানখান হয়ে গেল। বিবর্ণ মুখে সেই দিকে চেয়ে রইলেন। কেয়াও নিঃশব্দে টুকরোগুলো তুলে নিয়ে, খিড়কি দরজা খুলে, বাইরের গলিতে ফেলে দিয়ে এসে বলল, আরেকটা বের করে নিও, মাসি, আপদ গেছে।—মিটিং হল না, মাসি।

অলিমাসিমা পাশের চেয়ারটাতে বসে পড়লেন।

মিটিং হল না? যাওনি তা হলে বর্ধমানে?

কেয়া বললে,

না, না, গেছিলাম বইকি। সেখানে ওরা আশা করে থাকবে। মিটিংটা বন্ধ করে দেবার জন্যও তো যাওয়া দরকার ছিল। তবে শুধু অলক আর আমি গেলাম। বড়সায়েব নোটিশ দিয়ে মিটিং বন্ধ করিয়েছেন।

অলিমাসিমার দিকে ফিরে একটু উত্তেজিত ভাবে বলে,

এ কার কাজ জানো মাসি? আনন্দ ছাড়া আর কারো নয়। আসুক না কাল, ওকে আমি দেখে নেব।

কোনো কথাই অলিমাসিমার কানে যায় না। কিছু বলে না কেন, কেয়া? জমিটা কি ধ্বসে-টসে গেছে, কিম্বা ভূমিকম্প হয়ে পুঁতে গেছে? যত সব অসম্ভব কথা মনে হয় অলিমাসিমার। কেয়া কিছু বলে না, খালি আনন্দর ওপর রাগে ফুলতে থাকে। অলিমাসিমা আর পারেন না।

শেষটা কি সত্যি ভুলে গেলে, কেয়া?

কি ভুলে গেলাম, মাসি? ও, তোমার সেই জায়গাটা, না? তা, সেটা তো খুঁজেই পেলাম না। দু ঘণ্টা ধরে অলক আর আমি ঘুরে ঘুরে রাস্তাটাই পেলাম না। মেলা বাড়ি-ঘর, কারখানা, থানা এইসব হয়েছে ও-দিকটাতে। আবার সন্ধ্যেও হয়ে এল, রাস্তায় ভালো আলো নেই, ভালো করে খুঁজতেই পারলাম না, মাসি।

তারপর অলিমাসিমার রক্তশূন্য মুখের দিকে চেয়ে আবার বলে,

কেন অত ভাবো, বল তো, মাসি? জমি তো আর চোরে পকেটে করে নিয়ে পালাবে না। ও থাকবেই। অলক আবার শীগ্‌গিরই যাবে, দিনের আলোয় দেখে আসবে বলেছে।

যাক্, তাও ভালো। কেমন একটা যেন স্বস্তির ভাব আসে অলিমাসিমার। কি সব পাগলের মতো মনে হয়েছিল। পাহাড়ে কিম্বা নদীর ধারে ছাড়া আবার মাটি ধ্বসে যায় নাকি! তেমন ভূমিকম্পই

বা কবে হল যে পুঁতে যাবে। আর পুঁতে গেলেও তো সেখানটা ঢিবি-মতন হয়ে থাকত, সহজেই চোখে পড়ত। চেনে না, তাই খুঁজে পায়নি। খোঁজেওনি নিশ্চয়ই তেমন করে।

কেয়া বললে নাকি কোথায় খেয়ে এসেছে। শুয়ে পড়ল গিয়ে। তার আগে বার বার অলিমাসিমাকে বুঝিয়ে বলল, জমির জন্য না ভাবতে, আলোয় আলোয় একদিন সেও না-হয় অলকের সঙ্গে যাবে, একটা রবিবারে, কি অন্য ছুটির দিনে। জমি কিছু পালিয়ে যাচ্ছে না।

দুঃখ যে খানিকটা হয়নি অলিমাসিমার, তা নয়। তবে দুর্ভাবনার চাইতে দুঃখ শতগুণে ভালো। যারা চল্লিশ বছর অপেক্ষা করেছে, তাদের আর দশ-পনেরো দিনে কি বা এসে যায়। তবু মনের ভেতরটা একটু খচখচ করে।

শুয়ে শুয়ে হঠাৎ একটা সঙ্কল্প করে ফেলেন অলিমাসিমা। আরে তাইতো, এতক্ষণ মনে হয়নি কেন? কেয়া নয়, অলক নয়, এবার নিজেই যাবেন। একটা রবিবার, এবাড়ির ভার কেয়াকে দিয়ে, ভোর-বেলা চলে যাবেন, রাত্রে ফিরে আসবেন। নিজের চোখেই দেখে আসা ভালো। কারণ নক্সার কোনো অদলবদল করতে হলে, কাজ শুরু হবার আগেই করতে হয়, বটফলের দাদা বলেছেন।

কিন্তু খুঁজে পেল না কেন? নিশ্চয়ই সে রকম করে খোঁজেনি। সারাদিন হৈ চৈ করে, সন্ধ্যে নাগাদ একবার একটু ঘুরে দেখেছে। ধরেছেও তো সন্ধ্যের গাড়ি, ন'টার মধ্যে বাড়ি পৌঁছে গেছে। কেমন যেন মনমরা মনে হল কেয়াকে। তবে অলিমাসিমা কোনদিনই কেয়াকে তেমন নজর করে দেখেননি, এ কথাও সত্যি।

হয়তো এত সাধের মিটিংটা শেষ পর্যন্ত হল না বলে মন খারাপ। কেয়ার জন্য দুঃখ হয় অলিমাসিমার। একটা মিটিং হল না বলে যার মন খারাপ হয়ে যায়, তার মতো অভাজন কে বা আছে।

ছোট্ট কেয়াকে মনে পড়ে। একটা ছেঁড়া তালপাতার হাতপাখাকে বুকে জড়িয়ে, নেপুর মা'র খাটের পায়ের কাছে ঘুমোত। বেশ নোংরা মতো দেখতে পাখাটা, অলিমাসিমা সেটাকে একদিন টেনে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। অমন জিনিস কেউ ঘরে রাখে? বুকে নিয়ে শোয়? অসুখ করবে না? নেপুর মাও তাই বললেন।

কাঁদেনি কেয়া। রাতে বলল পেটব্যথা করছে, না খেয়ে শুয়ে থাকল। আজকের মতো অমনি করে, না খেয়ে, বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকল। নেপুর মা পরদিন অলিমাসিমাকে দিয়ে মোড়ের মাথা থেকে একটা সেলুলয়েডের পুতুল কিনে আনালেন। কেয়া সেটাকে নিয়ে খেলত বটে, কিন্তু বুকে জড়িয়ে নিয়ে শুত না। অদ্ভুত মেয়ে, কেয়া। ভারি দেমাকী।

শুয়ে শুয়ে ঘুম আসে না। যাদের রাতে ঘুম হয় না তারা অন্য একটা রাজ্যে বাস করে। সেখানে সব কেমন ছায়া ছায়া, আলো নেই, শব্দ নেই। সিঁড়ির নিচে কেয়াও কি ঘুমোয়? তবে তো কেয়া সুখী।

কেয়ার বিয়ের কথা মনে পড়ে অলিমাসিমার। এই বাড়ি থেকেই বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের জন্য ঠিক তৈরী ছিল না কেয়া, তবু কেমন যেন যোগাযোগ হয়ে গেছিল। নেপুর বাবা এ কথা বলেছিলেন যে ভালো পাত্র হাতছাড়া করতে নেই। বোধ হয় বুঝেছিলেন তিনি চোখ বুঁজলে, এ বাড়িতে কেয়ার ঠাঁই হবে না।

মনে পড়ে সানাই নিয়ে নেপু কি রাগারাগিটাই না করেছিল। অলিমাসিমা নিচে ভাঁড়ার দিচ্ছিলেন, এসে ঝুপ করে চৌকাঠের ওপর বসে পড়ে বলেছিল,

শুনছি নাকি চল্লিশজন বরযাত্রী আসবে, আড়াই শ লোক খাবে রাতে। বরপণও নিয়েছে কি না কে জানে। চুড়িতে, হারেতে,

কানপাশায় কুড়ি ভরি সোনা গেছে বোধ হয়। বাবা দেখলাম সিন্দুক থেকে হুটুবাবু যেমন যেমন বলছেন অমনি বের করে দিচ্ছেন।

অলিমাসিমার শরীরটা খুব ভালো যাচ্ছিল না। বলেছিলেন,

তা দেবেন না ? ওর বাবা তোমার মার আপনার মামাতো ভাই। ওলাউঠোয় মল সবাই, তোমার মা তখন তোমার বাবাকে বলে ওকে আনালেন। নিছক পরেতে আর আপনার লোকেতে তফাত তো হবেই। তোমার জন্য মেলা আছে নেপু, ঐটুকুতে কিছু এসে যাবে না। এর পর তো আর দিতে হবে না কিচ্ছু, ওদের অবস্থা শুনলাম বেশ স্বচ্ছল। তবে মেয়েরা নাকি ভারি সেকেলে। কেয়ার সঙ্গে কেমন বনবে কে জানে।

কেয়াকে কিন্তু পরেও খানিকটা দিতে হয়েছিল, একটুখানি জায়গা, দু মুঠো ভাত। কলেজে ফ্রি পড়ত, কোত্থেকে সব বই যোগাড় করে আনত। মনে পড়ে ততদিনে আনন্দ পাশ করে গেছে, কতক বই সেও জুগিয়েছিল। মাঝে মাঝে এসে পড়াও বুঝিয়ে দিত। যখন পাড়ার স্কুলে দুজনায় এক ক্লাশে পড়ত, তখন কেয়াই ইংরেজিতে বেশী নম্বর পেত। পরে অলিমাসিমা কেয়াকে আনন্দর কাছ থেকে ইংরেজি পড়া বুঝিয়ে নিতে দেখেছিলেন। তখন কেয়ার দেমাক কোথায় রইল অলিমাসিমা বুঝে উঠেন নি। আনন্দ বলেছিল ঐটাই ওর সব চাইতে বড় দেমাক।

ছোট একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অলিমাসিমা পাশ ফিরে শোন। ঘুম না হোলে রাজ্যের ভাবনা এসে মনটাকে জুড়ে বসে। কি ভাবে কেয়া, কে জানে। তবে কেয়া বলে রাতে বালিশে মাথা রাখলেই নাকি ও ঘুমিয়ে পড়ে। তাই কখনো হয় ? ভবিষ্যতের কথা ভাবে না কেয়া ?

পাঁচরকম কথা ভাবতে চেষ্টা করেন অলিমাসিমা, তবু ঘুরে ঘুরে ফিরে ফিরে ঐ একই কথা মনে হয়। জমিটার কোনো অনিষ্ট করে

দেয়-নি তো দাদা ? সেখানে গোয়ালটোয়াল বসানোও কিছু আশ্চর্য নয়। হয়তো আমগাছতলায় গোরু বেঁধে রাখে।

একটু একটু রাগ ধরে অলিমাসিমার। অলিমাসিমার নিজের হাতে পোঁতা গাছে দাদা গোরু বাঁধে কি বলে ? হয় তো গাছতলাটাকে নোংরা আঁস্তাকুড় করে রাখে।

আবার মনে হয়, এক দিক দিয়ে অবিশ্যি ভালোই, গাছটা সার পায়। নইলে অলিমাসিমার গাছে কেই বা সার দিত।

একদিন সুবিধে করে গিয়ে দেখে আসবেন অলিমাসিমা। কাউকে কিছু বলবেন না, সকালে গিয়ে বেশ রাত্রে ফিরে আসা যাবে।

মনে মনে বর্ধমান যাবার যোগাড়যন্ত্র করেন অলিমাসিমা। দাদার বাড়ি ওঠা হবে না। ওবাড়িতে শেষ ভাত খাওয়া আজও মনে আছে। বৌদির পা লেগে গেলাস উল্টে অলিমাসিমার পাতের ওপর জল গড়িয়ে গেছিল। একটু বিরক্ত হয়েছিলেন অলিমাসিমা। এক বেলা খাওয়া, তাও নষ্ট হলে যেমন হয়। কি যেন বলেওছিলেন।

সত্যি কথা বলতে কি বৌদি তখুনি নতুন পাত দেবার ব্যবস্থা করছিল, কিন্তু দাদার সে কি সব কথা ! ছুরির ধারের আঘাত সেরে যায়, কিন্তু কথার জ্বালা যায় না। অলিমাসিমা উঠে পড়ে, হাত ধুয়ে, ঠাকুরমশাইয়ের বাড়ি চলে গেছিলেন।

আশ্চর্য তখন জমিটার ওপর এতটুকু টান ছিল না। পেছন দিকের ফেলনা জমি, এক তিল তার বাহার নেই। পেছনের ঐ তারের দরজা দিয়ে মেথর যাওয়া-আসা করত। গাছ পুঁতেছিলেন ব্রত করে, নইলে হয়তো পুঁততেন না। এখানে আসবার পর একবার ঠাকুর-মশাইয়ের স্ত্রীই লিখেছিলেন—

ও জমি হাতছাড়া করিস নে, ও তোর বুড়ো বয়সের বারাণসী হবে, দেখিস।

পরে একটু একটু করে জমিটা কেমন যেন অলিমাসিমার মনের মধ্যে বেড়ে বেড়ে সবখানি জায়গা জুড়ে নিল। ঘুম না হলে অলিমাসিমা জমির কথাই ভাবেন। জমির কথা না ভাবলে ঘুম আসেও না। অন্যমনস্কভাবে পোঁতা গাছটার কথা ভাবেন। হিমসাগর আম গাছ।

নেপুদের বাড়িতে জিনিসপত্রের এত ছড়াছড়ি, কোনোটার. ওপর অলিমাসিমার এতটুকু লোভ নেই। একবার কে একজন ওঁদের নিকট-আত্মীয়া এসে মাস চারেক ছিলেন; অবস্থা ভালো নয়, কি যেন চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন।

এখন যেখানে নেপুর বাক্সের ঘর, ঐ ঘরে ক্যাম্প খাটে শুতেন। অলিমাসিমা দেখাশুনো করতেন। সারাদিন কাপড় ছাড়ার ঘরে অলিমাসিমা ব্যস্ত থাকেন, সেই নতুনমাসীও কাছে বসে থাকেন। নেপুর মা তখনো বেঁচে, কিন্তু নতুনমাসীর মনের কথা অলিমাসিমার সঙ্গে হত; নেপুর মার কাছে বড় একটা ঘেঁষতেন না।

ভারী লোভী মানুষ ছিলেন, উনি। অলিমাসিমার হাতে নেপুর মার চাবির গোছা দেখে তাঁর চক্ষুস্থির! কি যেন বলেওছিলেন নেপুর মাকে। তিনি তো হেসেই খুন।

আরে অলির হাতে চুরি চলবে না, ওর আনাড়ি হাত।

বাঁচেন নি ভদ্রমহিলা; শেষ সময়টাতে ভালো হাসপাতালের ডাক্তারও এসেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই আর কিছু হয় নি। তিনি মারা গেলে পর, তাঁর বাক্স গুছিয়ে মেয়ের কাছে পাঠাবার ভার পড়ল অলিমাসিমার ওপর?

কাপড়ের তলা থেকে নেপুর মার টুকিটাকি রাশি রাশি জিনিস বেরুল। যেখানটার যেটি অলিমাসিমা আবার গুছিয়ে রেখে দিয়েছিলেন। কেউ কিছু জানতে পারে নি। লোভ থাকে লোকের।

তবে অলিমাসিমার লোভ নেই। তাই বলে অলিমাসিমার জমির

এক তিলও ছাড়তে তিনি রাজী নন ; কেমন করে দাদা অলিমাসিমার জমিতে গোয়াল বসায় দেখে নেবেন তিনি ! দাদারও ভারি লোভ। অলিমাসিমার হাত ভরা চুড়ি ছিল, গলায় সোনার হার ছিল। বিধবা হলে পর সে সব খুলে দিদিমার বাক্সে রাখা হল। তারপর দিদিমা স্বর্গে গেলে তার আর কোনো পাত্তাই নেই !

ঠাকুরমশাই একবার খোঁজ করতে গেলেন, দাদা দাঁত খিঁচিয়ে বলল—

হ্যাঁ, সোনাদানা ছিল ! হীরে মতি ছিল না ? বৌদির আঁচল থেকে টান মেরে চাবি নিয়ে, দিদিমার আলমারি দরজা হাট করে খুলে দিয়েছিল। ঠাকুর মশাইয়ের কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিয়ে বলেছিল,

নিজের চোখেই দেখে যান, আপনার পেয়ারের অলকানন্দার কত ধনদৌলত আমি চুরি করেছি !

ভারি অপমান বোধ করেছিলেন ঠাকুরমশাই। আবার পুজো-পার্বনে দাদা তাঁরই পায়ের ধুলো নিত। এ ব্যাপারের পরেও নিয়েছিল। ঠাকুরমশাইও আপত্তি করেন নি। ঐ তাঁর বাপঠাকুরদার পেশা।

যাক গে, চুড়ি হারের জন্য অলিমাসিমার কোনোই দুঃখ নেই, ও দাদা নিক গে, যাকে খুসি পরাক। কিন্তু জমিতে কাকেও হাত ছোঁয়াতে দেবেন না অলিমাসিমা।

গিয়ে দেখেই আসা ভালো।

ভাবতে ভাবতে মনটা খুশি হয়ে ওঠে। পথ চিনে যেতে কোনই কষ্ট হবে না। মনে মনে কতবার গেছেন ও পথে।

তবে স্টেশনটা নাকি বদলে গেছে ; কেয়া যেমন বলল তাতে মনে হল, এই বেয়াল্লিশ বছরে স্টেশনটা একটা বিরাট ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। নাকি ভাল খাবার ঘর আছে। সস্তায় ভালো খাবার দেয়।

কিন্তু সেখানে অলিমাসিমার খেতে বাধোবাধো লাগে। বর্ধমানে থাকা কালে অলিমাসিমা গোঁড়া হিন্দু বাড়ির বিধবা মেয়ে ছিলেন। বাপের বাড়ি থাকেন, তাই মাথায় কাপড় দিতেন না। কিন্তু জামা গায়ে দিতেন না, সেমিজের ওপর থান পরে থাকতেন, বেরুতে হলে সর্বাঙ্গে তসরের চাদর জড়িয়ে নিতেন। এক বেলা খেতেন, দুপুর গড়িয়ে গেলে পর। সকালে ছোলা ভিজে, শশা, এইসব দিয়ে জল খেতেন। এক টুকরো পাটালি গুড় শেষে মুখে ফেলে দিতেন।

বর্ধমানের সেই পাটালি গুড়ের জন্য অলিমাসিমার মন কেমন করে। সেখানে গিয়ে স্টেশনে খাবেন কেমন করে? ওখানকার সে মানুষই যে আলাদা। তার নাম অলকানন্দা। অলিমাসিমা বলে কাউকে সেখানকার লোকে চেনে না। কত লোকের সঙ্গে ভাব ছিল অলি-মাসিমার তখন। ঠাকুরমশাইয়ের বাড়িতে কত লোকে দেখা করতে এসেছিল। স্টেশনে খাচ্ছেন দেখলে তারাই বা কি মনে করবে? কালের হিসেব মনে থাকে না অলিমাসিমার।

বাড়ি হয়ে গেলে, আবার অলিমাসিমা এক বেলা খাবেন, সকাল বিকেল ফল পাকুড় এই সব খেয়ে থাকবেন। তবে চা-টা না হলে চলবে না। আজকাল তো সবাই চা খায়, ওতে কেউ কিছু মনে করবে না।

কেমন যেন সারাদিনের গ্লানি কেটে যায়। মনে আছে দিদিমা রাত্রে শুতে যাবার আগে হাত-পা ধুয়ে শুদ্ধ কাপড় পরে জপ করবেন। অলিমাসিমা রোজ হালুয়া করে, দুধ গরম করে দিতেন। দিদিমা খেতেন, অলিমাসিমাকেও একটু খাওয়াতেন। তখন সূর্য ডোবার পরই অলিমাসিমা সন্ধ্যা করতেন। হালুয়া মুখে দিতে দিতে দিদিমা প্রায়ই বলতেন, দিনের গ্লানিটুকু এবার কাটল রে, আয়, শুতে যাই।

দাদার বাড়ি ছাড়ার পর অলিমাসিমা আর সন্ধ্যা করেন নি। পরে

সময়ও পান নি। সারা দিনের মধ্যে বিকেলের পর থেকেই ছিল এ বাড়ির সব চাইতে কাজের সময়।

নেপুর মা গন্ধ দেওয়া গরম জলে হাত মুখ ধুয়ে, সুন্দর করে সাজ-গোজ করতেন রোজ। নেপুর বাবা কোর্ট থেকে ফিরলে, একসঙ্গে বাগানে বসে চা খাওয়া হত। সন্ধ্যার পর হয়তো বেরুতেন। ছুটো-ছুটি করতে হত অলিমাসিমার। হয়তো বন্ধুবান্ধব আসতেন, মহিলারা ওপরে এসে নেপুর মা'র নতুন শখের জিনিস দেখে যেতেন। কখন সন্ধ্যা করবেন? কি দরকার সন্ধ্যা করবার? চোখ বুঁজলেই চোখের সামনে যার সবুজ ঘাসে ঢাকা এক ফালি শ্যামল মাটি ভেসে ওঠে, যার ওপর আমগাছের ছায়া পড়ে, কি প্রয়োজন তার সন্ধ্যা করবার?

একবার যেন কেয়া উঠল মনে হল। আজ কি কেয়ার চোখেও ঘুম নেই? বালিশটাকে আঁকড়ে ধরেন অলিমাসিমা। কি ভাবলে ঘুম আসে? কেয়ারা কেন জমি খুঁজে পেল না? পোস্টাপিসে জিজ্ঞেস করল না কেন? পোস্টাপিসের একটা বাড়ি পরেই তো সে গলি।

চোখ বেঁধে দিলেও অলিমাসিমা যে জায়গাটা খুঁজে পাবেন।

চোখের পাতা ভারি হয়ে আসে। গির্জার ঘড়িতে দেড়টা বাজে। অলিমাসিমা ঘুমিয়ে পড়েন।

আশ্চর্য লাগে ভাবতে একজন মাত্র লোক চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, একটা গোটা বাড়ির হালচাল কেমন বদলে যায়। নিজের প্রতিপত্তি-টুকুকে শতরঞ্জির মতো গুটিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে চলে গেছিলেন নেপুর বাবা। শ্রাদ্ধের এক সপ্তাহ পরে আর বাড়িটাকে চেনবার জো ছিল না।

পুরোন মানুষগুলিও সব কে কোথায় খসে পড়েছিল। আশ্চর্য যে এতদিন যাদের ওপর এ বাড়ির সমস্ত দেখাশুনোর ভার ছিল, তারা কেমন বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেল। আর একটিবারও এসে খোঁজখবর করল না। নেপুর তাতে কোনো দুঃখ ছিল না। বলত—যাক গে ওরা। এখন কড়া লোকের হাতে পড়েছে, এখন তো আর নিজেদের সুবিধেটি করে নিতে পারবে না। আর আসবে কেন?

তখন কেয়া ছিল শ্বশুরবাড়িতে। আনন্দ কাজ করত বোম্বাই শহরে। রইলেন শুধু অলিমাসিমা। গয়লা, ফকরুল, ধোপারা, নকুড়বাবু—এরা সব হালের আমদানি।

বন্ধুবান্ধব ছিল জামাইয়ের, ক্বচিৎ আসত তারা। অলিমাসিমার মনে হত জামাই নিজেই হয়তো তেমন আগ্রহ দেখাত না, মাঝে মাঝে ক্লাবে-ট্লাবে তাদের খাওয়া-দাওয়া হত। জানতে পারলে নেপু রাগ করত।

নেপু বেশী বন্ধুবান্ধব পছন্দ করত না। বলত বেঁচে থাক মিস্টার সিনহারা, ঐ আমার যথেষ্ট। পাঁচজনের সঙ্গে দহরম-মহরম, ও আমি দেখতে পারি নে।

কেউ বাড়িতে এলে নেপু মনে মনে রুষ্ট হত, ভালো করে তাদের সঙ্গে কথা কইত না। একে একে তারাও প্রায় সকলেই যে যার চলে গেল। তবু আত্মীয়স্বজনরা আশা করে থাকে; তারা সহজে ছাড়তে চায় না। নেপুর ছেলেপুলে নেই, ভাবে এত খাবে কে? নেপুর বাবার উইলের কথা বড় একটা কেউ জানে না। তা ছাড়া নেপুদের নিজেদেরও তো দেদার আছে। জামাইয়ের ভালো পসার।

আনন্দও এদের ছাড়তে পারে না মনে হয়। তিন চার বছর বোম্বাই থেকে কলকাতার হেড আপিসে এসেছে, সেখানেই তার কায়েমী চাকরি। মাঝে মাঝেই এসে খবর নিয়েছে। কেন কে জানে?

এ বাড়ির ওপর তো ওর খুব বেশী টান থাকার কথা নয়। বাসিন্দাদের ওপরেও নয়। অবিশ্যি জামাইয়ের কথা আলাদা। এখানে এতকাল থেকেও যেন সে এখানকার নয়। তবে খোলসের ভেতর ঢুকে থাকে, তাকে চেনবার জানবার উপায় নেই। নেপুর সঙ্গে বোধ হয় পেরে ওঠে না। সংসার চলে নেপুর ইচ্ছামত। কিম্বা হয় তো নেপুর জিনিসে জামাইয়ের হাত দেবার ইচ্ছে নেই। আনন্দর সঙ্গে তার ভারি প্রীতির সম্বন্ধ। যা কিছু পরামর্শ ওরই সঙ্গে হয়।

সব সংসারেরই জীবনযাত্রা মাঝে মাঝে বদলাতে হয়। সিঁড়ি ভাঙ্গা জামাইয়ের পক্ষে ভালো নয় নেপুও বোঝে, তবু যেন বহুকালের পুরোনো নিয়ম ভাঙ্গতে মন সরে না। আনন্দর কাঠ-কাঠ কথা সব। বললে, বেশ নেমো না, থাকো ওপরেই, জামাইবাবু কদ্দিন টেঁকে দেখব।

নেপু ঘাবড়ে যায়, মরাকে তার ভারি ভয়। বলে, নিচে ঘর কোথায় যে থাকব? না থাকে তো ভাড়াটে তুলে দাও। না হয় তারা যাক ওপরে, তোমরা নামো।

কিন্তু যদি না ওঠে, তা হলে তো মামলা করতে হয়। মামলাকেও নেপুর ভয়। জামাই হেসে ফেলে—

মামলা করে খাই আমরা, নেপু, মামলাকে কি আমাদের ভয় করলে চলে?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মামলা করতে হয় না। একতলার সামনের দিককার মাদ্রাজী ভাড়াটে দিল্লী বদলি হয়ে নিজেরাই উঠে গেল। ঘর খালি হয়ে গেল। এবার আর কোনো বাধা রইল না। দোতলাটা ভাড়া দিলে অনেক বেশীই পাওয়া যাবে।

নেপুর বড় ভাবনা। এই গন্ধমাদন সরাতে হবে, অলিমাসি, নিচে নেমে নতুন করে সংসার পাততে হবে, ভেবেও গা শিউরে

উঠছে। ওসব দরজা জানলা কতকাল খোলা হয় নি, বাবার যাবার পর থেকে অমনি কত দিন বন্ধ আছে। এখন ওসব খোলা হবে ভাবতে কেমন লাগে।

বহুদিন পরে মাঝখানকার দরজা-জানলাগুলো খোলা হল। কেমন একটা পরিষ্কার হাওয়া বাড়িময় বইতে লাগল।

আনন্দ দোতলার জন্য কি একটা আপিসের ভাড়াটে ঠিক করে দেয়। নেপুর ততটা পছন্দ নয়; তবে আপিস নিলে ভাড়া নিয়ে গণ্ডগোল হয় না, তারাই সারিয়ে নেবে, আপত্তির কোনোই কারণ থাকে না। তবু মনটা কেমন খুঁতখুঁত করে।

অলিমাসিমার কিন্তু মনটা খুশি হয়, এই তো কেমন যোগাযোগ হয়ে যাচ্ছে। আর ওপর নিচু টানা-হ্যাঁচড়া করা নয়, সিঁড়ির মাঝখানের দরজাতে তালা দিতে হবে না, গোটা বাড়িটা নেপু চোখে চোখে রাখতে পারবে। তবে একটা ভালো লোক রাখতে হবে। আর জামাইয়ের কোর্টের বেয়ারাকেও এ বাড়িতে থাকতে বলতে হবে। শঙ্কর না হয় সব ঘর ধোয়ামোছা করে দিল, নেপুর কোনোদিনই কোনো বাছবিচার ছিল না। নতুন লোকটা না হয় রাঁধাবাড়া ধোয়া-পাকলা সারল। তবু জামাইয়ের দেখা-শোনার জন্য ঐ পুরোনো বেয়ারাটাই ভালো। ভারি অনুগত জামাইয়ের, আছেও প্রায় পনরো বছর, ওর বাবাও নেপুর বাবার কাছে বহুদিন কাজ করেছে। খুব বিশ্বাসী চৌকোস লোকটা। জামাইয়ের অমনটিই দরকার।

ঘরদোর গুছোতে গুছোতে অলিমাসিমার চিন্তার আর শেষ থাকে না। আসছে মাসের পয়লা থেকে দোতলার ভাড়াটে এসে যাবে, আর অলিমাসিমাও ক্যান্টিনে বহাল হবেন। বটফলের বাড়ির সেই ঘরখানিরও ব্যবস্থা করেছেন। একটু ছোট, তবে অলিমাসিমার এখানকার ঘরের চাইতে ছোট হবে না। চৌকো বলে ওরকম মনে

হয়। খটখটে শুকনো, বাইরে একহাত সান-বাঁধানো জমি, তার পরেই উঁচু রেলিং, তার পরেই রাস্তা ; সামনে একটা পানের দোকান। সেখানে অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বলে, হট্টগোল চলে। বছর দুত্তিন বেশ চলে যাবে সেখানে। অত শুকনো যখন, সমস্ত পশ্চিমের রোদটা ঘরে ঢুকতে পায়, স্বাস্থ্যও নিশ্চয় ভালো। অন্ততঃ এখানকার চাইতে ভালো। এখানেও তো অলিমাসিমা দিব্য বেয়াল্লিশ বছর কাটালেন। কি এমন মন্দ স্বাস্থ্য ? ঐ যা এক নিচু হতে গেলেই হাঁটুর পেছনে খিল ধরে, পিঠটা টনটন করে ওঠে। তাও একটু হবে না ?

তবে এক শ টাকা দেবে না, পঁচানব্বই দেবে। তাই বা মন্দ কি ? বটফলের দাদা বলছিলেন, আসছে মাস থেকেই কাজ শুরু করে দেবেন ; সব খরচ নাকি একসঙ্গে লাগে না। অলিমাসিমারও এখনি সেখানে যাবার দরকার নেই। রবিবার-টবিবার বেশ গিয়ে দেখে আসতে পারবেন, কাজ কেমন এগুল।

ষণ্ডা দেখতে মজুররা ওপরের সেই সব ভারি ভারি সাবেকি সিন্দুক আলমারি নিচে নামায়। নেপু সেগুলি কিছুতেই খালি করে দেবে না। সবসুদ্ধুই নামাতে হয়। তবে বাসনের আলমারি খালি করে না দেওয়া পর্যন্ত একচুল নড়ানো গেল না। তাল তাল রুপোর বাসন, গোছা গোছা খাগড়াই কাঁসা বের করতে হয়। বিরাট এক কাঁঠাল-কাঠের বাসনের সিন্দুকের তলা থেকে ছোট একটা তামার বাক্সে গোটা পাঁচেক মহারানী ভিক্টোরিয়ার আমলের মোহর বেরোয়। নেপুর আহ্লাদ আর ধরে না।

বাবার প্রথম রোজগার, অলিমাসি। মা তো ঠাকুরপুজো করত না, ঠাকুমার লক্ষ্মীর ঝাঁপিটা আমার ছোটকাকিকে দিয়ে দিয়েছিল। তার বদলে বিলিতী বাক্সে মহারানীর মুখ দেওয়া মোহর ক'টি রেখেছিল। বলত, দেখিস, ঐ পুরনো ঝাঁপিটার চাইতে এর পয় কত

বেশী হবে। হলও তাই। ছোটকাকি পঁচিশ বছর বয়সে বিধবা হল, পরের বছর ম'ল। ওর ছেলে ঐ আনন্দটা কতক মামার বাড়ি খেয়ে, কতক আমাদের খেয়ে মানুষ হল। তার আবার কত বড়াই দেখ। নতুন মোটর কিনছে নাকি এই মাগ্‌গির বাজারে। ভাবে বোধ হয় জ্যাঠার সম্পত্তি রইল, আমার আর কি ভাবনা। রোজগারের পয়সাগুলো দিই উড়িয়ে।

নেপু ওপরে ওপরে এটা ওটা গুছোয় আর বলতে থাকে।

কি চালাক দেখলে তো, অলিমাসি? ওপরটা কেমন সাহেব কোম্পানির মাথায় হাত বুলিয়ে চমৎকার করে সারিয়ে নিচ্ছে। বাবার সময় যেমন ছিল, দরজা জানলা আগাগোড়া সব সাদা রঙের করিয়ে নিচ্ছে। কি ধূর্ত বুঝলে তো? আসলে নিজের খরচ বাঁচাচ্ছে। কিন্তু ওকে বলে দিও, অলিমাসি, আমি সহজে মরছি না। আরো কুড়িটি বছর বাঁচব।

কেয়াও ছিল সঙ্গে; একা পেরে ওঠেন না, ছুটির দিন অলিমাসিমা ডেকে এনেছেন। কেয়া বললে, আনন্দের এসবের ওপর কোনো টান নেই, নেপুদি, বলে নাকি হাতে পেলেই সের দরে বেচে দেবে। গোর-স্থানে বাস করতে পারবে না, নাকি ওর ভারি ভূতের ভয়।

নেপু গম্ভীর মুখ করে বলে,

কেয়া, তোমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে, রোজগারপাতি কর, স্বাধীন-ভাবে থাক, আমার কিছু বলবার নেই। কিন্তু দোতলা ভাড়া হয়ে যাচ্ছে, সিঁড়ির পাশের দরজাটা খোলা হবে, ওদিক দিয়ে তারা যাওয়া-আসা করবে। সিড়ির তলাটা আর জুড়ে থাকলে চলবে না।

কেয়া হেসে বলে, বাঁচালে নেপুদি, আমিও কথাটা কি করে ভাঙি তাই ভাবছিলাম।

নেপু জিজ্ঞেস করে, কোন্ কথাটা ভাঙবে?

এই এখান থেকে চলে যাবার কথা।

যাবে কোথায় শুনি? যাবার একটা চুলো আছে তোমার?

কেন আনন্দ বলছিল,

তোমায় কি কোনো লজ্জাও নেই, কেয়া? আনন্দর সঙ্গে তোমার কি?

কেয়া কিছু বলে না, মৃদু হেসে বাক্স থেকে বাসনগুলি বের করতে থাকে।

অলিমাসিমা জানেন আনন্দের সঙ্গে কেয়ার কিছু নয়। কেয়ার ভাব ঐ অলক ছোকরার সঙ্গে। যাকে দেখলেই বোঝা যায় একটা লক্ষ্মীছাড়ার একশেষ। কি সব চালাক-চালাক কথা অলকের। কি রকম ঘরের ছেলে কে জানে। কেয়া তো বলে বামুনের ছেলে, বনেদী ঘর, তবে অবস্থা পড়ে গেছে। কে জানে।

আজকাল আর বড় একটা আসে-টাসে না। কি দরকারই বা আসবার, রোজ তো কেয়ার সঙ্গে দেখা হয়। যেখানে সেখানে এক-সঙ্গে চা-টা খায় বোধ হয়। রাস্তা থেকে যে পান কিনে খাওয়ায়, এ তো অলিমাসিমার স্বচক্ষে দেখা। আনন্দ ঠিকই বলে, একটা অতি খেলো টাইপের ছেলে। কেয়া আনন্দর সঙ্গে কথা বলে না মনে হয়। রোজ আনন্দ আসে, অলিমাসিমার সঙ্গে কত গল্প করে যায়, কিন্তু কেয়া সেখানে থাকে না। আনন্দও তার নাম করে না।

খুব ইউনিয়ন নিয়ে মেতেছে কেয়া। বিপদে না পড়ে। ভালো করে মনে নেই অলিমাসিমার, কিন্তু নেপুর বাবা বেঁচে থাকতে, মিস্টার সিনহাদের আপিসের বাবুরাও ঐ রকম ইউনিয়ন-টিউনিয়ন করেছিল। তারপর সেই থেকে কিসব গোল মাল হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত জেলে গেছিল কয়েকজন। বলেছেনও কেয়াকে। সে কারো কথা কানে তোলে না, ভাবে ওর মতো কেউ কিছু বোঝে না। অলিমাসিমা তো

নয়ই ; মুখ্যু অলিমাসিমা। অলিমাসিমার মনে হয় কেয়া আসলে অলিমাসিমাকে ঘেন্না করে, তাই কথা কানে তোলে না। ওর যত পরামর্শ ঐ অলকের সঙ্গে।

বলেন কথাটা আনন্দকে। আনন্দ খানিক চুপ করে থেকে বলল, কেয়া ওর স্বামীর নামে মামলা করে বিয়েটা ভেঙে নেয় না কেন ?

অলিমাসিমা আকাশ থেকে পড়েন,

কি যে বল, আনন্দ, ভদ্রঘরের বৌ, তোমারও কি একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই ?

আনন্দ অলিমাসিমার পাশে বসে পড়ে বলে,

কেন, দেবে না কেন ? শুধু ঐখানে ওর একটু আত্মসম্মানের অভাব দেখি। বিয়ের পরই ওর যথাসর্বস্ব নিয়ে গেছে চলে ; সেখানে বিয়ে-থা করে সুখে ঘরকন্না করে ; তিনটে ছেলে হয়েছে, তা জানো ? কেয়া কেন ওকে ছেড়ে দেয় না, বলব ? স্রেফ সাহসে কুলোয় না বলে, পাছে কেউ কিছু বলে, সেই ভয়ে। নিন্দের ভয়ে।

অলিমাসিমা কাষ্ঠহেসে বলেন,

নিন্দে করতে ছাড়ে না তো লোকে। তাদের দোষও দেওয়া যায় না। কারণ না থাকলে তো আর কেউ নিন্দে করে না।

আনন্দ বলে, করে না ? কি যে বল ; নিন্দের আবার একটা কারণ থাকা চাই নাকি ? আমাকে চোর বলেছিল নেপুদি, মনে নেই তোমার ? জ্যাঠাইমার তামার বাক্স সুদ্ধ মোহর পাওয়া যাচ্ছিল না, তাই আমাকে চোর বলেছিল। মোহর কখনো চোখে দেখিনি, অলিমাসি। জ্যাঠাইমার বাৎসরিক হচ্ছিল, নেপুদি বাক্সটা বের করে সবাইকে দেখাচ্ছিল, বলছিল খুব নাকি পয় ঐ বাক্সটার। আমার কিন্তু পয় হয়নি। বিকেল থেকে বাক্স পায় না—

অলিমাসির কেমন যেন অসহ্য মনে হয়। বাধা দিয়ে বলেন, আমার

খুব মনে আছে, আনন্দ, বাড়িসুদ্ধু লোকের সামনে অমন কেলেঙ্কারির কথা মনে থাকবে না ? তুমি নতুন কলম এনেছিলে, বলেছিলে গড়ের মাঠে কুড়িয়ে পেয়েছ। কিউ বিশ্বাস করেনি।

আনন্দ একটা ছোট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে, তুমিও না, অলিমাসি, তুমি আমাকে মস্ত এক বক্তৃতা দিয়েছিলে। শুধু কেয়া বিশ্বাস করেছিল। সকলের সামনে বলেছিল, হ্যাঁ, ও নেবে বাক্স! ওর সাহসেই কুলোবে না! ওর তখন বিয়ের কথা হচ্ছিল, অলিমাসিমা, তারপরই জ্যাঠামশাই আমাকে হোস্টেলে পাঠালেন। আর এখানে থাকিনি।

খানিক চুপ করে আনন্দ বলে, যাক গে, ওসব পুরোনো কথায় আর কার কি এসে যায় বল। এখনি দেখে এলাম নেপুদির হাতে সেই বাক্স, বাসনের সিন্দুক থেকে নাকি বেরিয়েছে।

অলিমাসিমা বললেন, বাৎসরিকের দিন-ই হয়তো পুজোর বাসনের সঙ্গে তুলে ফেলেছিল। ও বাক্স আর খোলাই হয়নি। তোমার জ্যাঠামশায় তো আর পরের বছর ছিলেন না যে, বাৎসরিক করবেন।

আনন্দ উঠে পড়ে, একটু হেসে বলে, জ্যাঠামশাইও ঐ কথা মনে করে গেলেন, এই যা দুঃখ! জানো, অলিমাসি, নেপুদি ঘটনাটা একদম ভুলে গেছে। আমাকে এক্ষুনি মহাখুশি হয়ে বাক্সটা দেখাল!

কেয়ার কিন্তু মনে ছিল। জামাই তাকে বাক্স পাওয়ার কথা বলতেই তার চোখেমুখে আলো জ্বলে উঠেছিল। বাঃ, পাওয়া গেছে? আনন্দ তাহলে সত্যি নেয়নি, নেপুদি, তখন তুমি কি-না বলেছিলে!

নেপু অবাক হয়ে যায়। কি বাজে বকছ, কেয়া, আমি আবার কাকে কি বললাম। ওটা তো বাসনের বাক্সের মধ্যেই ছিল।

নেপুর সত্যি কিছু মনে নেই। অলিমাসিমা কাজ ফেলে নিচে গিয়ে নিজের ঘরে দোর দেন। মোজাটা বের করে নোটগুলি আরেকবার

গুনে দেখেন সাত হাজার দশ টাকা। তার সঙ্গে আরো দুটি এক-টাকার নোট রাখেন, খুচরো কিছু হাতে ছিল। কবে খরচ হয়ে যাবে। একবার যা মোজায় ভরবেন তা মনে মনে উৎসর্গ করা হয়ে গেল, আর অন্য কোনো প্রয়োজনে তাকে প্রাণ ধরে অলিমাসিমা বের করে দিতে পারবেন না।

অগোছালো বাড়ির কি একটা অশান্তির হাওয়া, অলিমাসিমার ছোট ঘরের বন্ধ দরজা ভেদ করে, ভেতরে প্রবেশ করে, অলিমাসিমাকে সারারাত জাগিয়ে রাখে। বহু নিশার স্বপ্ন বুঝি মুঠোর মধ্যে এল, তবু বুকের ভেতরটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। বড় ভয় হয় যদি ফাঁকাটা সত্যি না ভরে। অন্ধকার রাত চোখের ওপর বোঝার মতো ভারি হয়ে ওঠে। কানের মধ্যে বাজনা বাজে না।

আবার সকাল আসে। অলিমাসিমা উঠে পড়েন, খাবার ঘরের দরজা-জানলা খুলে দেন, হিটারে চায়ের জল চাপান। টেবিলের ওপর চায়ের বাসন সাজান। গয়লা এসে ডাক দেয়, দুধ মেপে নেন, ডুলি খুলে পাঁউরুটি বের করেন। নেপু সিঁড়ির মাঝখানকার দরজার তালা খুলে দেয়। কুকুর তিনটে ছুটে নেমে আসে, অলিমাসিমার চারধারে নেচে-কুঁদে সারা হয়। তিনজনকে তিনটে লেড়ুয়া বিস্কুট দিতে হয়। শঙ্কর খিড়কি দিয়ে তাদের বেড়াতে নিয়ে যায়। রোজই এমনি হয়, তবু সকাল থেকে এ দিনটাকে কেমন অন্যরকম মনে হয়। আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে, খাবার ঘরের আলো জ্বালতে হয়।

কেয়া আসে।

মাসি, বড় ভাবনায় আছি, জানো? টাকা বড় খারাপ্ জিনিস, রাতের ঘুম নষ্ট করে দেয়, তা জানতে?

কেয়া বলে,

তাও যদি নিজের টাকা হত। আমার বালিশের তলায় সাত হাজার টাকা আছে, ভাবতে পার? আজ সকালে অলক নিয়ে ব্যাঙ্কে দিয়ে আসবে, নিশ্চিন্দি।

পাশের চেয়ারে বসে হঠাৎ কেয়া বলে,

একটা নিয়ম ভাঙব, মাসি, এক পেয়ালা চা দেবে?

সারারাত ঘুমোয়নি কেয়া, চোখের কোলে কালি পড়েছে।

সাত হাজার টাকা পাওয়া এত সহজ! অলিমাসিমা বলেন,

কার টাকা, কেয়া? তোমাদের ইউনিয়নের? ব্যাঙ্কে রাখবে না?

কেয়া বলে, ব্যাঙ্কেই তো রাখার জন্য আনা। জায়গায় জায়গায় ছিল, আবার সরকারী সাহায্যটাও পাওয়া গেল, এখন সব এক করে তুলে রাখলেই নিশ্চিন্দি। কি যে হল কাল চারদিক দিয়ে, আর হয়েই উঠল না। ঘরে আনাটা একেবারে বে-আইনী।

অলিমাসিমা ব্যাঙ্কের ব্যাপার বোঝেন না। তবু বলেন, সত্যি ঘরে আনাটা ঠিক নয়, কেয়া, অতগুলো পরের টাকা। কালই তুলে দেওয়া উচিত ছিল।

কেয়াকে চিন্তিত মনে হয়,

উচিত তো ছিলই, মাসি। কিন্তু অলক—

কেয়াকে চুপ করতে দেখে, কেয়ার হাতে চায়ের পেয়ালা দিয়ে অলিমাসিমা বলেন, অলক কি?

নাঃ, কিছু না। যাক গে আজ দশটায় ব্যাঙ্ক খুললেই জমা দিয়ে আসবে, কাগজপত্র কাল সব সইটই করে রাখা হয়েছে। শরীরটা ভালো লাগছে না, মাসি, রাতে বোধ হয় জ্বরও এসেছিল। চা-টা খাইয়ে বাঁচালে, মাসি।

অলিমাসিমার ভালো লাগে না। কেয়ার কখনো অসুখ করে না,

এখন আবার না কোনো ফ্যাসাদ বাধায়। নেপু শুনলেই তো রেগে যাবে, বলবে, যেতে বল, যেতে বল কোথাও হাসপাতালে-টাসপাতালে, কে জানে কি ছোঁয়াচে রোগ ঢোকাবে শেষে। জ্বর গায়ে যাবে চলে কেয়া, বাড়ির অকল্যাণ হবে।

বাড়ি বলতেই ছোট আরেকটা বাড়ির কথা মনে আসে, যেখানে মনের পাখিরা ডানা গুটিয়ে বসতে পারে। কেয়াকে বলেন, জ্বর গায়ে আপিস যাওয়া হবে নাকি, কেয়া ?

কেয়া বলে, ভেবেছিলাম একবার ব্যাঙ্ক হয়ে আপিস হয়ে, ছুটি করিয়ে নিয়ে আসব। কিন্তু ভোরে একবার মাথা ঘুরে পড়েই গেলাম।

কপালে একটু কালসিটের দাগ। অলিমাসিমার বিরক্ত লাগে। যত সব অবুঝের মতো কথা। বলেন,

না, কিছু গিয়ে দরকার নেই। তোমাদের ঐ অলকটির হাতে চিঠি দাও, আর ব্যাঙ্কেও সে-ই যাক না। সে না সেক্রেটারি ?

কেয়া বলে, একটা ঘরও তো দেখে নিতে হয়।

আবার উঠে দাঁড়িয়ে বলে,

আজ বরং শুয়েই থাকি মাসি, কাল যাব। শরীরটা সত্যি বড় খারাপ করেছে।

অলিমাসিমা জিজ্ঞেস করেন, শোবে কোথায় ? সারাদিন সিঁড়ি দিয়ে মিস্ত্রী-মজুররা ওঠানামা করে, আজ তো সিঁড়ির ওখানকার দেওয়াল চাঁচা হবে শুনলাম, ওখানে থাকা যাবে না, কেয়া।

কেয়া অলিমাসিমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। অলিমাসিমা বলেন,

কোথায় ঘর ঠিক করবে ভেবেছ ?

দেখি, ছু'একটা মেয়েদের হোস্টেল আছে, খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে।

একতলাটা গোছগাছ করে নিতে এক সপ্তাহ লাগবে। নেপুরা আজ মিসেস সিনহাদের বাড়ি যাবে, দিন সাতেক থাকবে। সকালে ওঁদের গাড়ি এল নিয়ে যেতে। আনন্দও এসেছিল, যদি দরকার হয়। তার গাড়িতেই স্বচ্ছন্দে ওরা যেতে পারত। কিন্তু নেপু কিছুতেই আনন্দের নতুন গাড়িতে চড়বে না। মুখের ওপর পষ্টাপষ্টি বলে দিল। আনন্দ হেসে বলল—

কেন, চড়বে না কেন? আমার কিন্তু ছোটবেলায় তোমাদের মোটরে চড়বার ভারি শখ ছিল। চড়েওছিলাম দু'একদিন জ্যাঠা-মশায়ের সঙ্গে। কিন্তু তুমি পারলে আমার নাক ছিঁড়ে নিতে।

নেপু কোনো উত্তর না দিয়ে মিস্টার সিনহার পুরনো গাড়িখানিতে চেপে বসল।

ওরা গেলে পর, আনন্দ একবার কেয়ার কথা জিজ্ঞেস করল। জ্বরের কথা শুনে, একবার ঘড়িটা দেখল, কিছু বলল না। নেপু কেয়াকে চলে যেতে বলেছে শুনে শুধু বললে—

চলি, অলিমাসি, দেখি ও-বেলা যদি আসতে পারি। একটা ডাক্তার ডাকলে পার।

দশটার সময় অলক এসে টাকা আর চিঠি নিয়ে গেল। অলি-মাসিমা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

কিন্তু অলককে কিছুতেই ভালো লাগে না, ওকে দেখলেই মনটা খিঁচড়ে যায়। কতই না ভালো লাগার লোক অলিমাসিমার জীবনে! তার ওপর আজকাল আবার একে ভালো লাগে না, ওকে ভালো লাগে না! অলকের সঙ্গে অলিমাসিমার কি?

কেয়া একটু খুঁতখুঁত করে, আমারো সঙ্গে যাওয়া উচিত ছিল, মাসি, ওর একার ঘাড়ে দায়িত্বটা চাপানো ঠিক হয়নি।

মিস্ত্রীরা আসে, দিনের কাজ শুরু হয়ে যায়, চারিদিকে মিহি চুনের

গুঁড়ো ওড়ে, সব কিছুর ওপর একটা সূক্ষ্ম চুনের প্রলেপ পড়ে থাকে। অলিমাসিমা বারে বারে ঝাড়েন।

কেয়া জ্বর গায়েই তার ছড়ানো জিনিসপত্র বাক্সে তোলে, বিছানাটা জড়িয়ে রাখে। সিঁড়ির তলাটাও রং হবে, দেয়াল চাঁচা হবে, খালি করে না দিলেই নয়। মঙ্গল একবার এসে জিনিসগুলি এদিক্‌কার খালি ঘরের একধারে তুলে দিয়ে যায়। কেয়া সারাদিন চাদর জড়িয়ে, যে ঘরে নেপুর বাবা পড়াশুনো করতেন, সেখানে কৌচের ওপর পড়ে থাকে। অলিমাসিমা বারেবারে দেখে আসেন। কেমন একটা ঝড়ে-ওড়া ভাব্‌ সারাবাড়িটায়। অতীতকাল অনেকদিন এবাড়িতে বাসা বেঁধে ছিল, সে হঠাৎ তল্পিতল্পা গুটিয়ে নিয়ে যেন বিদায় নিচ্ছে।

কেয়া ত্বটো কথা বললে ভালো লাগত। বারে বারে দোরগোড়ায় গিয়ে দাঁড়ান অলিমাসিমা। বিকেলে এক পেয়ালা চা খাইয়ে আসেন। কেয়া বলে,

জানো, মাসি, এ বাড়িতে আমি কত বছর থেকেছি? পাঁচবছর বয়সে এসেছিলাম, মা মরে যাবার পর। একটানা এগারো বছর ছিলাম, মাসি। বিয়ে হয়ে পাঁচবছর শ্বশুরবাড়িতে থেকেছিলাম, তার-পর পিসেমশাই নিজে গিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। আবার এখানে থেকে চারবছর কলেজে পড়েছি; ত্ব বছর দিল্লীতে ট্রেনিং নিয়েছি; আবার এখানে এসে তিনবছর চাকরি করছি। একরকম বলতে গেলে জীবনটাই কাটালাম এখানে।

পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে, পাশ ফিরে বলে, ত্ব-এক দিনের মধ্যেই চলে যাব। আর কখনো আসব না।

অলিমাসিমার কেন জানি শীত-শীত করে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, সারাদিন টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। এইখানে একটা অধ্যায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। কেয়া আরো বলে,

কত লোক থেকেছে এ বাড়িতে। আশ্চর্য না মাসি, জিনিসপত্র-গুলো সব পড়ে রয়েছে, মানুষগুলো সব চলে গেছে। একবার বর্ষা-কালে আনন্দ আর আমি স্কুল থেকে ফিরতে জুতো ভিজিয়েছিলাম বলে নেপুদি আমাদের একতলার এই স্নানের ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল, খেতে দেয়নি। আমরা একটা মরচে-ধরা পেরেক দিয়ে দরজায় কাটাকুটি খেলেছিলাম ; দেখলাম তার দাগগুলো এখনো রয়েছে। আনন্দকেও কেউ ভালোবাসত না। দুষ্টুও ছিল না কম।

অলিমাসিমা হঠাৎ বলেন, কেন, সরকার মশাই তো তোমাদের দুজনকেই ভালোবাসতেন।

কেয়া খুশি হয়ে ওঠে।

ওঁর স্ত্রীও বাসতেন। শীতকালে আমাদের হাত-পা ফাটত বলে পুরোনো ঘি মালিশ করে দিতেন। আনন্দর আর আমার গা থেকে সারাদিন বোটকা গন্ধ বেরুত।

কে কবে কোথায় কেয়াকে এক কণা ভালোবাসা দিয়েছিল, কেয়া যত্ন করে তার হিসেব কষতে বসে যায়। অলিমাসিমার বুকের ভেতর কেমন করতে থাকে, কি জানি জ্বরটর বাড়েনি তো ; কথাগুলো যেন কেমন কেমন। বসে থাকতে পারেন না বেশীক্ষণ, ওদিকে একটা মানুষ নেই, বাড়িময় মিস্ত্রীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি খেয়াল হয়, সাহস করে একটা বিক্রিওয়ালা ডেকে, খাবার ঘরের তক্তাপোশের ওপর থেকে পুরোনো খালি শিশি, বোতল, টিন রাশি রাশি বেচে ফেলেন। তক্তাপোশ সরিয়ে, তলা ঝাঁট দেওয়ান ; বারকোস, কুলো তলা থেকে টেনে বের করে ওপরে রাখান। কোথাও ময়লা রেখে যাবেন না অলিমাসিমা।

অযথা খাটতে থাকেন অলিমাসিমা। আঠারো বছর ধরে এখানে থাকার হিসেব দিয়েছে কেয়া ; অলিমাসিমা থেকেছেন একটানা

বেয়াল্লিশ বছর। ভালোবাসার হিসেব কষেছে কেয়া; কি হবে ভালোবাসা দিয়ে? মানুষকে ভালোবাসা মানেই দুঃখ পাবার ব্যবস্থা করা। অলিমাসিমাকে দুঃখ দিতে পারে এমন কেউ নেই দুনিয়াতে।

সন্ধ্যাবেলা শূন্য খাবার ঘরে অলিমাসিমা একা কাঁদেন তাঁকে দুঃখ দেবার লোক নেই বলে। বর্ধমানের বাড়ি তো শুধু নিরবচ্ছিন্ন সুখ দেবে, তবে দুঃখ দেবে কে? অলিমাসিমার চোখ দিয়ে অবিরল জল পড়তে থাকে।

একটা শব্দ যেন কানে আসে, চোখ মুছে অলিমাসিমা কান পেতে থাকেন। কার পায়ের শব্দ না? অলিমাসিমার সর্বাঙ্গে কাঁটা দেয়। দোতলার দরজা-জানলা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বন্ধ করিয়েছেন। নিচের তলারও এদিকে সব বন্ধ, শুধু সামনের দরজা এখনো খোলা। শিহরণ লাগে অলিমাসিমার সারা গায়ে, কানে যেন হাজার হাজার পায়ের শব্দ আসে বছরের পর বছর ধরে।

বুক ঢিপঢিপ করে। ভাবেন গয়লাকে একবার ডাকি। নিঃশব্দে নেপুর বাবার পড়বার ঘরের দিকে এগিয়ে যান।

কেয়া!

আনন্দ ডাকে, কেয়া!

পাথর হয়ে যান অলিমাসিমা। এমন করে আনন্দ কেয়াকে ডাকতে পারে? এমন করে কেউ কাকেও ডাকতে পারে অলিমাসিমা জানতেন না!

পথের আলো খোলা জানলা দিয়ে এসে কেয়ার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। কেয়া উঠে বসে, বিস্ফারিত নয়নে শুধু চেয়ে থাকে, কেয়ার কালো চুল শুধু ঝোড়ো বাতাসে উড়তে থাকে, কেয়ার মুখে কথা সরে না

কথা? ভালোবাসার আবার কথা কি? বক্ষ থেকে বক্ষে ভালোবাসা নীরবে কথা কয়। কেয়াকে উঠে আসতে দেখলেন না অলিমাসিমা, আনন্দকে কাছে যেতেও দেখলেন না। দেখলেন শুধু দুজনায় গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ। এরই জন্য বুঝি সমস্ত বর্ষার সন্ধ্যাটি অপেক্ষা করে ছিল; এইবার আকাশের বুক চিরে জলের ধারা নামল। নিঃশব্দে অলিমাসিমা ঘরে ফিরে এলেন। বহুক্ষণ খোলা জানলা দিয়ে নারকোল গাছের গুঁড়ি বেয়ে জলের ধারা নামা দেখলেন। নিজের ফালি ঘরখানিতে গিয়ে আজ আর দরজায় খিল দিলেন না। দরজা খোলা রইল।

তাকের ওপর থেকে কৌটো নামিয়ে গোলাপী রেশমী মোজাটি বের করলেন। শীতল, কোমল; ভালোবাসার মতো আঁকড়ে ধরে না, কেবল খসে খসে যায়। নোটগুলি আরেকবার গুণে রাখলেন। সাত হাজার বারো টাকা।

আজ শিশি, বোতল, বাক্স বেচে কুড়ি টাকা পাওয়া গেছে। সংসার-খরচের টাকার সঙ্গে রেখে দিলেন অলিমাসিমা। নেপু এলে দিয়ে দেবেন। কোথায় কি বাকি রয়ে গেল ভাবতে বসেন। নেপুদের কাছে কথাটা এখনো কিছুতেই পাড়া যায়নি। কাল রাতে খাবার সময় একটু চেষ্টা করেছিলেন। একতলায় থাকা, আরো দু-একটা লোক থাকলে ভালো, ওদিকে চাকরদের একটা ঘরও পাওয়া গেল। কোর্টের বেয়ারা এখানেই থাকুক না, সব সময় হাতের কাছে থাকবে, নিজের ঘরে রাঁধাবাড়া করে খাবে। জামাই খুশিই হল, নেপুও আপত্তির কোনো কারণ দেখেনি।

তার বেশী আর বলা হল না। বললেই তো নেপু রাগমাগ করবে, আগেকার দিনের কথা বলবে। নেপুর মুখে আগেকার দিনের কথা শুনতে ভালো লাগে না অলিমাসিমার। আগেকার দিনের সঙ্গে আর

কি সম্বন্ধ ? দুদিন বাদেই দড়াদড়ি কেটে ভেসে পড়বেন অলিমাসিমা। আর এ বাড়িতে আসা হবে না।

আর কখনো যে এ বাড়িতে আসা হবে না, এ কথা অলিমাসিমা নিশ্চিত জানেন। জানলার নিচের তক্তাটার ওপর ব্যাঙের ছাতার রূপের মেলা আর দেখা হবে না। কেউ হয়তো কোনদিন টান মেরে শ্যাওলা-ঢাকা তক্তাটাকে দেবে ফেলে। অলিমাসিমাকে দেখতেও হবে না, দুঃখ পেতেও হবে না। বেয়াল্লিশ বছর ধরে দুঃখ পাবার পথগুলি সব বন্ধ করে ফেলেছেন অলিমাসিমা। বর্ধমানে গিয়ে শেষ বয়সটা নিরবচ্ছিন্ন সুখে কাটাবেন। কারো কিছু বলবার থাকবে না। টাকা-গুলো সব ঝেড়েঝুড়ে শেষ করে দেবেন ; আর টাকা গুনবেন না। নতুন সব বন্ধু করবেন ; বটফলের অভাবও টের পাবেন না। এখানকার কোনো কিছু আর ঠাঁই পাবে না অলিমাসিমার জীবনে। আর এ বাড়িতে আসবেন না অলিমাসিমা।

বর্ধমানে নতুন করে সকাল হবে।

আর কেয়া ? আনন্দ আর কেয়া ?

নেপু রেগে অন্ধ হবে। কিন্তু জামাই হয়তো খুশি হবে। অলি-মাসিমা গেলে শেষটা জামাইয়ের কোনোরকম অসুবিধে হবে না তো ? বেয়ারাটাকে একটু বলে দিতে হবে।

আর আসবেন না অলিমাসিমা এ বাড়িতে, যেখানে বেয়াল্লিশ বছর বাস করে, অলিমাসিমা কারো হাতে দুঃখ পাবার ক্ষমতা হারিয়েছেন।

তবে আনন্দ আর কেয়া মুখে যাই বলুক, ওরা আসবে। প্রথমটা আসবে না হয়তো, কিন্তু পরে নিশ্চয়ই আসবে। বেশীক্ষণ বসবে না হয়তো, কিন্তু মাঝে মাঝে এসে জামাইকে ওরা দেখে যাবে নিশ্চয়ই। দুঃখ পাবার আশ্চর্য ক্ষমতা যে ওদের। এখনো হয়তো পরস্পরকে বুকে

জড়িয়ে ধরে, কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে। সারা জীবন হয়তো দুজন দুজনাকে ভালোবাসবে আর কাঁদাবে। কে জানে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবেন অলিমাসিমা,

উঃ, ভারি বেঁচে গেছি। বর্ধমানে একবার গিয়ে বসতে পারলেই হল। বিশ্রাম পেলেই এই হাতে পায়ে খিল-ধরা সেরে যাবে। কি একটা মালিশ করে দেয় বটফল ; লণ্ঠনের ওপর তেলের বাটি বসিয়ে গরম করে, হাতে পায়ে ঘষে দেয় বটফল। ভারি আরাম হয়।

বটফলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হলেও, ওর কাছেও ঋণী থাকবেন না শেষ পর্যন্ত। অলিমাসিমা বটফলকেই ঐ বাড়ি লিখে দিয়ে যাবেন। অবিশ্যি এখুনি কিছু মরছেনও না অলিমাসিমা, দিদিমা সাতাত্তর বছর বেঁচে ছিলেন। আর তাই যদি কেউ বলে, মরতে ভয় নেই অলিমাসিমার। বাঁচতেই যে ভয় পেল না, তার আবার মরার ভয় ! অলিমাসিমার হাসি পায়। এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন অলিমাসিমা। এ বাড়িটা যেন দুনিয়ার আর সব বাড়ি থেকে আলাদা। যেই নেপুর মা বাবা চোখ বুজল, অমনি তারা এ বাড়ি থেকে একেবারে ধুয়ে মুছে গেল। দুদিনের জন্য নেপুরা অন্য জায়গায় গেছে, অমনি যেন বাড়িটা ওর গা থেকে তাদের বেঁচে থাকার চিহ্নগুলো ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। তারা ফিরে না আসা পর্যন্ত এ-বাড়ির কোথাও তাদের খুঁজে পাওয়া যাবে না।

অলিমাসিমাও চলে গেলে তাঁর বেয়াল্লিশ বছরের এ বাড়িতে বাস করা অমনি করে মুছে যাবে। মাঝে মাঝে মনে হত এতদিন থেকে থেকে বুঝি এখানকার দরজাজানলার একটা হয়ে গেছেন। সে কথা ভুল। দরজাজানলা খুলে নিয়ে গেলে ফাঁকা রেখে যায় ; অলিমাসিমা বেয়াল্লিশ বছর এ বাড়ির ওপরে ওপরে এমনি আলগোছে বাস করেছেন, বাড়ির গায়ে কোথাও একটুখানি আঁচড় কাটতে পারেন নি।

বাইরে ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ে, তার মধ্যে মনে হয় কে যেন

খিড়কি দরজায় গুমগুম করে কীল মারে। চমকে ওঠেন অলিমাসিমা, আজ সন্ধ্যেবেলাটায় কোথাও একটুখানি শব্দ হলেই শিউরে ওঠেন অলিমাসিমা। কুকুরগুলো ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

পুরনো ছাতাটা খুঁজে নিয়ে, খিড়কি দোরটা খুলতে হয়। ভাঙা আকাশ মাথায় করে অলক দাঁড়িয়ে। কিন্তু এমন একটা বিভ্রান্ত বিস্রস্ত মর্মাহত অলক, যে হঠাৎ দেখলে চেনা যায় না। জামা-কাপড় ভিজে গায়ের সঙ্গে লেপ্টে রয়েছে; চুল বেয়ে, মুখ বেয়ে জলের স্রোত বইছে, এমন একটা জলে ধোয়া মর্মান্তিক নৈরাশ্যের প্রতিমূর্তি অলি-মাসিমা জন্মে দেখেন নি।

কি যেন বলতে চেষ্টা করে অলক, কথাগুলি বৃষ্টির ঝাপটার সঙ্গে উড়ে যায়, অলিমাসিমার কান পর্যন্ত পৌঁছয় না। তাকে কর্কশভাবে ভেতরে আসতে বলে, খিড়কি দোর বন্ধ করেন। খাবার ঘরের বাইরে উঠোনের ধারে একটুখানি ছাদ দেওয়া, তার নিচে অলক দাঁড়িয়ে থাকে। খিড়কির পাঁচিলের ওপর দিয়ে পথের আলো তার সাদা মুখের ওপর পড়ে।

বলে, কেয়া?

কথা বলতে ঠোঁট কাঁপে, হাত কাঁপে। খোলা দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে জল আসে, অলিমাসিমা অলককে ঠেলে ঘরে ঢুকিয়ে, দরজা বন্ধ করে দেন।

বাইরে ঝড়বৃষ্টির মাতামাতি চলে, অলক বলে,

কেয়াকে বলুন টাকাগুলো সব গেছে।

সে কি কথা! টাকাগুলো সব গেছে আবার কি? টাকা গেলে কেয়া করবে কি?

কঠিন স্বরে অলিমাসিমা বলেন, সে বাড়ি নেই, আমাকে বল। গেল কি করে ?

অলকের ভাঙা ভাঙা কথা জোড়া দিয়ে নিতে হয়। ব্যাঙ্কে সোজা না গিয়ে, কি একটা জরুরী কাজে কোন্ বন্ধুর কাছে যেতে হয় নাকি, একটা চায়ের দোকানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়—

অলিমাসিমা ভাবলেশহীন মুখে অলকের দিকে চেয়ে থাকেন। হাতের পাতা দুটি উল্টে কি একটা হতাশার ইঙ্গিত করে অলক বলে,

বিশ্বাস করুন কেমন করে গেল জানি না। যখন খেয়াল হল, ব্যাগসুদ্ধু নেই। কেয়াকে জানাতে হবে।

অলিমাসিমার গলাটা চাপা খনখনে শোনায়।

কেয়া কি করবে ? তার সাত হাজার টাকা আছে ? পুলিশে খবর দিয়েছ ?

কাউকে খবর দেয়নি অলক। জানাজানি হলে দুজনার চাকরি যাবে। আর শুধু চাকরি নয়, পুলিশের হাঙ্গামা লাগবে।

অলিমাসিমা ধৈর্য হারান, কি রকম আক্কেলশূন্য ছেলে তুমি। পড়ুক এবার হাতে হাতকড়া। ঠিক হবে। কিন্তু কেয়া ?

অলক কম্পিত হস্তে মুখ ঢাকে। তাকে অবিশ্বাস করার কথা অলিমাসিমার একবারও মনে হয় না। মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাকে চেয়ে দেখেন অলিমাসিমা, কি একটা অদৃশ্য বাতাসে তার সমস্ত শরীর কাঁপছে।

ঘাড়ের কাছের চুলগুলি ছোট করে কাটা। হাতের কব্জির হাড় দেখা যায়, কি রকম অসহায় একটা ভাব মনে হয়।

রাগ ধরে অলিমাসিমার। অলকের জুতো ভরা জল, ঘর ভিজে যাচ্ছে, কাপড়-চোপড় থেকে নদী বইছে। রগের কাছে একটা শিরা ধুকধুক করছে।

কর্কশ কণ্ঠে বলেন,

জুতো খোল। এসো আমার সঙ্গে। নিজের ঘরে নিয়ে যান বাউণ্ডুলে ছোঁড়াটাকে। আলনা থেকে নিজের শুকনো থান দেন। কাশী-সিল্কের চাদরখানি দেন। নিজের গামছাখানি দেন।

কঠিন গলায় বললেন, কাপড় ছাড়। চুল-টুল মোছ। একটু ভদ্রলোকের মতো হও।

এ ঘরে এসে চায়ের জল চাপান। উঠুক একটু মিটারে।

অলক এসে নিঃশব্দে দাঁড়ায়। চেয়ার দেখিয়ে বলেন, বোসো।

তারপর একটু চুপ করে থাকেন ; অলক আর সইতে না পেরে ভগ্নকণ্ঠে বলে,

বলুন কি বলবেন,

অলিমাসিমা হঠাৎ বলেন,

সেদিন বর্ধমানে গিয়ে কেয়ার সঙ্গে জায়গা দেখে এসেছিলে ?

অলক মাথা নাড়ে। ওরকম কোনো জায়গা খুঁজে পায় নি ওরা। ঠিকানা মিলিয়ে নক্সা মিলিয়ে ভালো করে দেখেছিল।

অন্ধকার হয়ে গেছিল তখন, ভালো করে দেখলে কি করে ?

না, অন্ধকারে যায়নি তো, দিনের বেলাতেই দেখে এসেছিল।

রাস্তাটাই খুঁজে পেলে না ? নাম বদলেছে হয়তো, কাউকে জিজ্ঞেসও করলে না ?

মুখ তুলে অলক বলে,

রাস্তার নাম বদলায় নি, মাসিমা। কিন্তু জমি তো দেখলাম না।

অলিমাসিমার বুকের স্পন্দন কমে আসে। বিরক্ত হয়ে বলেন—

কি, চুপ করলে কেন ? জমি নেই তো কি আছে সেখানে ?

একটা মোটরগাড়ির কারখানা আছে।

অলিমাসিমা রুদ্ধকণ্ঠে বলেন,

পেছনে একটা দোতলা সাদা বাড়িও নেই বলতে চাও ?

অলক অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে বলে,

আছে, মাসিমা। সেখানে কারখানার মালিক থাকেন।

অলিমাসিমার মাথা গরম হয়ে ওঠে। এ তো বোঝাই উচিত ছিল, দাদা যে সহজে ও-জমি ছেড়ে দেবে না, এ তো জানা কথা। বলেন,

একটা হিমসাগর আমের গাছ দেখলে ?

না মাসিমা, কোনো আমগাছ নেই ওখানে। কোনো গাছ-ই নেই।

ছোট একটা নিশ্বাস ফেলে অলিমাসিমা বলেন, তোমরা ভুল জায়গা দেখে এসেছ, অলক, ঠিক করে চিনতে পারোনি। কারখানার মালিকের নাম কি ?

অলক বলে, নিকুঞ্জ মাইতি। সব খোঁজ নিয়ে এসেছিলাম, মাসিমা।

অস্ফুট স্বরে অলিমাসিমা বলেন, তবে কেয়া যে বললে সময় পাওনি, দেরী হয়ে গেছিল। কেন বাজে বকছ, অলক, ভালো করে দেখনি মোটেই। মালিকের নাম হারাধন মুখোপাধ্যায়, মোটাসোটা ফর্সা দেখতে। ভুল বাড়ি দেখে এসেছ, অলক। বাড়িটা ঐ হারাধনের, কিন্তু জমিটা অন্য লোকের। ওতে একটা হিমসাগর আমের গাছ আছে।

আকুল কণ্ঠে অলক বলে,

না না, মাসিমা, কেয়া আপনাকে ইচ্ছে করে বলে নি, ভুল করা কি অতই সহজ ? ও যে আমার চেনা পথ, চেনা বাড়ি। ও বাড়িতে আমি জন্মেছিলাম, মাসিমা, হারাধন মুখুজ্জে আমারই বাবার নাম। কুড়ি বছর হল তিনি মারা গেছেন। মা বাড়ি বেচে দিয়ে আমাদের মানুষ করেছেন। আমি জানি না ও-বাড়ি ?

মাথার সব রক্ত হৃৎপিণ্ডে নামে। হৃৎপিণ্ডেও ভাঁটা পড়ে। কর্কশ কণ্ঠে বলেন, ক' ভাই তোমরা ?

আমি ছাড়া কেউ নেই, মাসিমা। আমার বড় ভাই পাঁচ বছর বয়সে মারা যায়, আমি তাকে চোখেও দেখি নি। শুধু মা আর আমি।

আমগাছ ছিল না কখনো ওখানে?

অলক তবুও বলে, আমগাছ নেই, মাসিমা, কিন্তু ঐ বাড়িই ঠিক। আমগাছ বাবাই হয়তো কেটে ফেলেছিলেন, কারখানাকে ভাড়া দেবার সময়। পরে ওরাই সবটা কিনে নিল।

কি মনে হওয়াতে অলক আবার বলে, কার বললেন পেছনের জমিটা? তাকে জিজ্ঞেস করবেন তো দলিলপত্র আছে কি না।

অলিমাসিমা চুপ করে থাকেন।

দলিলপত্র? দিদিমা বলে গেছেন; আবার দলিলপত্র কি? দাঁড়িয়ে মাপজোক করিয়ে, মনসা পুঁতে দিয়েছিলেন, ঠাকুরমশাই নক্সা এঁকে দিয়েছিলেন, আবার দলিলপত্র কিসের?

ধীরে ধীরে অলিমাসিমার শিরার মধ্যে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয়ে আসে। অলক! দাদার ছোট ছেলে অলক। ভুরুর কাছটা যেন মার মতন। মার মুখটা ভালো করে অবিশ্যি মনে পড়ে না। ছেলেবেলায় দাদার ঘাড়ের চুল ঐ রকম খোঁচা-খোঁচা হয়ে থাকতো, দাদার ঘাড়টা ঐ রকম সরু ছিল, দাদা তখন ভালো ছিল, ইস্কুল থেকে বাড়ি এসেই ডাকত,—অলকানন্দা। পকেটে পেপারমিণ্ট লজেঞ্চুষ আনত, তাতে ইংরেজিতে কি সব লেখা থাকত। অলক!

অলক উঠে দাঁড়ায়। অলিমাসিমা বলেন, জল ফুটে গেছে, অলক, বোসো। বৃষ্টি পড়ছে এখনো। অলক বলে,

কিন্তু—

অলিমাসিমা চা ঢেলে দেন। ডুলি থেকে টিনের মধ্যে রাখা কুচো নিমকি বের করে দেন।

কেয়া কখন ফিরবে, মাসিমা ? কি যে হবে ভেবে পাইনে।

কেয়াকে তুমি কি ভালোবাস ? বিয়ে করতে চাও ?

অলক স্তম্ভিত হয়, কেয়াকে বিয়ে ? কি যে বলেন, মাসিমা, কেয়ার তো কবে বিয়ে হয়ে গেছে। খুব ভালো মেয়ে কেয়া। কিন্তু কি হবে এবার কে জানে। তুজনারই চাকরি যাবে।

অলিমাসিমা উঠে দাঁড়ান। উনি যে মাথায় এতটা লম্বা, অলক আগে অতো লক্ষ্য করেনি। কেমন যেন বেঁটে মনে হত।

অলিমাসিমারও মনে হয় অলক যেন কত ছোট হয়ে গিয়েছে। ওর সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপে। চোখের পাতা কাঁপে, ঠোঁট কাঁপে, হাত কাঁপে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। মনে হয় নাবালক।

অলিমাসিমা ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন, চোখের পাতা পড়ে না। এই তবে বাপের কুলের একমাত্র বংশধর, এই ঝড়ে-ওড়া পাখির ছানাটা! গলার কাছটা ধরে আসে, নিশ্বাস ফেলতে কষ্ট হয়।

বাতাসে খিড়কি দরজা দোলে, ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হয়, অলিমাসিমার হাত তুখানি ব্যথা করে। ঐ লক্ষ্মীছাড়া ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরবার জন্য অলিমাসিমার তুই হাত টনটন করে। রোদে-পোড়া কপালে হাত বুলিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। চোয়াড়ে গালের মাঝখানে লম্বা একটা টোল পড়ে, তার ওপর চুমো খেতে ইচ্ছে করে অলি-মাসিমার।

ততক্ষণে বৃষ্টি ধরে এসেছে, খাবার ঘরের দরজা খুলে তাকে একরকম ঠেলে বের করে দেন। কর্কশকণ্ঠে বলেন,

যাও, চলে যাও, আর এসো না এ বাড়িতে। আনন্দ কেয়াকে বিয়ে করবে, তুমি যাও।

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে অলক। কম্পিতকণ্ঠে বলে,

কিন্তু টাকাটা ? তার কি হবে ? কেয়া যদি—

অস্বাভাবিক আবেগে অলিমাসিমার গলার স্বরটা উঁচু শোনায়। বলেন,

বলছি কেয়া নেই। কোথায় পাবে কেয়াকে? তুমি চলে যাও। যা হয় কেয়া করবে, এখন যাও তো।

হাত পা কাঁপতে থাকে অলিমাসিমার। উঠোন পার হয়ে, খিড়কি-দোর খুলে দেন। আবার বলেন,

বৃষ্টি থেমে গেছে। এইবার যাও।

পথ দেখিয়ে দেন।

আর দাঁড়ায় না অলক, ছুটে চলে যায়, কিছু বলে না, পিছন ফিরে তাকায় না। দাদার ছেলে অলক। বুকটা তোলপাড় করে অলিমাসিমার।

অস্বাভাবিক জোরে খিড়কি দরজা বন্ধ করে, ঘরে এসে বসেন।

তক্তাপোশের জিনিসগুলোকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে অলিমাসিমা বসে পড়েন। মাথা ঝিমঝিম করে। বুকে টান ধরে। চোখে ভালো দেখতে পান না। এত কম পাওয়ারের আলো এদিককার সব ঘরে। কোত্থেকে এক দমকা বাতাস এসে খালি ঘরগুলির মধ্যে হু-হু করে বেড়ায়। একবার হাতটা তোলেন অলিমাসিমা, আঙুলগুলো এমনি কাঁপতে থাকে যে, তখুনি আবার নামিয়ে রাখেন। ভাবতে পারেন না।

কেয়া এসে ঘরে ঢোকে। এ যেন কেয়া নয়, আর কেউ। এমন আর কেউ যে অন্য কোনো রাজ্য থেকে এসেছে; পায়ে যার ধুলো লাগলেও, ঠোঁটে মধু জমে আছে। চোখে যার আলো জ্বলে।

চোখে চোখে চেয়ে থাকে দু'জনায়। অনেক পরে অলিমাসিমা শান্তকণ্ঠে বলেন,

আনন্দ চলে গেল ?

কেয়া বলে,

হ্যাঁ।

একটু থেমে বলে,

মাসি—

আর বলতে পারে না। এমন কথা থাকে, কথা দিয়ে যাকে বলা যায় না।

অলিমাসিমা বলেন,

জানি, কেয়া, আর বলতে হবে না।

কেয়া ঘাড় তুলে উন্মুক্ত দৃষ্টিতে অলিমাসিমার দিকে চেয়ে থাকে।

স্বাভাবিক স্বরে অলিমাসিমা বলেন,

সুখী হবে তোমরা ?

গলা ভেঙ্গে যায়। বলেন,

সুখ এত প্রচুর নেই দুনিয়াতে, যে পেলে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া চলে।

উঠে মুখ ঘুরিয়ে, কাজে লেগে যান। টুকিটাকি জিনিস সরাতে থাকেন, নুনদানিতে নুন ঢালেন, ডুলির ওপরটা ঝাড়েন।

কেয়া দাঁড়িয়ে থেকে থেকে ফিরে দাঁড়ায়।

অলিমাসিমা ডেকে বলেন,

কেয়া, শোনো। অলক এসেছিল। টাকা জমা দিতে পারে নি, কি যেন গোলমালে পড়ে গেছিল। কোনো দায়িত্বজ্ঞান যদি থাকে ও ছেলের।

কেয়া দরজা ধরে দাঁড়ায়।

তা হলে রাখল কোথায় টাকাটা, মাসি ? জমা না হওয়া অবধি যে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

অলিমাসিমা বলেন,

ওর জন্য আর মাথা ঘামিও না, কেয়া, এখন নিজেদের বিষয় ভাবো। আনন্দরও তিন কুলে কেউ নেই, তোমারও নেই। তোমরা নিজেদেরটা নিজেরা করে না নিলে চলবে কেন?

কেয়া বসে পড়ে, বোধ হয় শীত করে, ছোট চাদরটা টেনে গায়ে জড়ায়।

কেমন করে কি হবে ভেবে পাচ্ছিনে, মাসি।

অলিমাসিমা পাথরের মতো স্থির হয়ে যান। কেন, কি বলে আনন্দ?

বলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিছুদিন হয়তো অপেক্ষা করতে হবে, তারপর সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। নতুন আইনের কথা বলল, মাসি। এতদিন কিছু আশা করি নি, নিশ্চিন্তে ছিলাম; এখন কেমন ভাবনা হচ্ছে, মাসি।

অলিমাসিমা হাতের ভিজে পেয়ালা নামিয়ে রেখে, কলটা বন্ধ করে দিয়ে, নিজের আঁচলে হাত মোছেন। কাছে গিয়ে বলেন,

তোমার গায়ে জ্বর, কেয়া, এতক্ষণ বসে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না। যাও, শুয়ে পড়। কিছু খেলেও না আজ সারাদিন, কাল দুর্বল মনে হবে। একটু দুধ গরম করে নিয়ে যাচ্ছি আমি, তুমি শোও গে।

কেয়া শুতে যায়। ম্লান হেসে বলে, ঘুম যে আসে না তোমার মতো, মাসি। ঘুম না হলে রাজ্যের ভাবনা এসে মাথায় ঘোরে। তুমিও তো ঘুমোও না, মাসি, কি ভাবো বল না?

কেয়া ও ঘরে চলে যায়, অলিমাসিমাও দুধ গরম করে ওকে খাইয়ে আসেন। কেয়া বলে,

টাকাটার জন্য ভাবনা হচ্ছে মাসি। ওদের বাড়িতে অতগুলো টাকা রাখার সে রকম নিরাপদ জায়গাই নেই। আমার সঙ্গে একটু

দেখা না করেই চলে গেল অলক ? তুমি ওকে একটু বসতে বললে না কেন ?

কি যেন মনে হয় অলিমাসিমার, সংক্ষেপে বলেন,

নাও, উঠে বস দিকি নি, চুলটা জট ছাড়িয়ে বেঁধে দিই। টাকাটার জন্য এত ভাবছ ? সে তো সঙ্গে নিয়ে যায় নি, আমার কাছে রেখে গেছে।

কেয়া অবাক হয়ে যায়। অলিমাসিমা আর কিছু বলেন না। খাবার ঘরের পাশের ছোট ঘরখানিতে গিয়ে, তাকের ওপর থেকে কৌটো নামান। কৌটো খুলে মোজা বের করেন। রেশমী মোজায় গিঁটের ফাঁস ভালো করে ধরে না, খুলতে কোনো কষ্ট হয় না। বারোটি টাকা রেখে আর সব বের করে খাটের ওপর ঢেলে ফেলেন। পাশের ঘর থেকে ব্রাউন কাগজের ঠোঙা এনে, গুণে গুণে সত্তরটি একশ' টাকার নোট তার মধ্যে রাখেন। কৌটোটা তাকে তোলেন, মোজা বালিশের তলায় রেখে, এ ঘরে এসে কেয়াকে ডাকেন।

তোমার কাছেই রেখে দাও কেয়া, কাল নিজে গিয়ে জমা দিয়ে এসো ; যার তার হাতে না দেওয়াই ভালো। যাই, ও ঘরের পাট তুলে আসি।

নিজের ঘরের তক্তাপোশের ওপর অলিমাসিমা বসে থাকেন। মাথাটাকে কেমন যেন হাল্কা মনে হয়। পিঠটাকে টান করে বসেন।

কানের মাঝে বাজনা বাজে, কান ঝালাপালা হয়ে যায়, ঘরময় সুর ছড়িয়ে পড়ে, ছাদের কোণায় কোণায় ধাক্কা খেয়ে অলিমাসিমার কানে ফিরে ফিরে আসে।

খোলা জানলা দিয়ে চেয়ে দেখেন অলিমাসিমা। বাইরে বৃষ্টি পড়া থেমে গেছে। ছাদের আলসে থেকে, নারকোল গাছের পাতা থেকে, টুপটাপ জল পড়ে। নালা দিয়ে কলকল করে জল ছোটে ; শিরশির

সরসর করে নারকোল গাছের পাতা নড়ে। মেঘ সরে যায়, চাঁদ বেরিয়ে পড়ে, উঠোনের ধারে ধারে জমানো জলের ওপর চিকচিক করে।

ছোটঘরের জানলা দিয়ে চাঁদের আলো ঘরে আসে।

ব্যাঙের ছাতারা দুলতে থাকে। কেমন একটা ভিজে ভিজে সোঁদা গন্ধে ঘর ভরে যায়।

বুক ভরে নিশ্বাস নেন অলিমাসিমা। প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়।

হাত-পাগুলোকে হাল্কা মনে হয়; মনে হয় আর খিল ধরবে না।

অলিমাসিমা ছুটি পেয়েছেন।